বোখারী শরীফ

(বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা)

প্রথম খণ্ড

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ)
প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল জামেয়া কোরআনিয়ার
ফয়েজ ও বরকতে

মাওলানা আজিজুল হক সাহেব
মোহাদ্দেছ জামেয়া কোরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা
কর্তৃক অনুদিত।

হামিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ
৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১১

পরিচিতি

মওলানা শামছুল হক (রঃ) কর্তৃক লিখিত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ - وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الَّذِىْ لَا نَبِىَّ بَعْدَهٗ وَعَلٰى

اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ اٰثَرُوا الدِّيْنَ عَلَى الدُّنْيَا وَاٰثَرُوْهُ بِيَقِيْنِهٖ

সারাবিশ্বের মানুষ-জাতির কল্যাণ কামনা নয় শুধু, কল্যাণ সাধনের জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল মুসলিম জাতির এক জাতি এবং এক ভাষার কর্মসূচী। প্রাথমিক যুগের বীর মুসলিমগণ তাঁদের কর্তব্য পালন করিয়া কর্মসূচী অনুযায়ীই কাজ করিয়াছিলেন। সিরিয়া, ফিলিস্তিন, জর্দান, ইরাক, লেবানন, মিশর, তিউনিস, আলজেরিয়া—এমনকি স্পেন পর্যন্ত সকলের ভাষা একই ভাষা একই আরবী ভাষা হইয়া গিয়াছিল। সকলেই এক জাতি এবং এক ভাষাভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। একটু যখন দুর্বলতা ও শিথিলতা আসিল তখন পারস্য, আফগানিস্তান ও ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে ভাষা দেশীই রহিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার অক্ষর একই আরবী অক্ষরে পরিবর্তিত করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

কিন্তু হতভাগা আমরা বাঙ্গালী মুসলমান যাহারা নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব হইতে অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি। আরবী ভাষা ত দূরের কথা আরবী অক্ষরেও দেশী ভাষাকে লিখিয়া দেশের লোকের নিকট সমাদৃত করিতে পারি নাই। এমনকি বহু অগ্রে যে কাজ করার দরকার ছিল যে, দেশে যে ভাষা বা যে লিখন-প্রণালী প্রচলিত আছে তাতেই কোরআন হাদীছ অনুদিত করিয়া দেশের লোকদের চাহিদা মিটানো হউক এবং আলো দান করা হউক, তাহাও করা হয় নাই। পরম পরিতাপের বিষয়—আজও বাংলা ভাষায় কোরআনের বা হাদীছের এমন কোন তরজমাকারক নাই বলিলেও চলে যাহাকে সর্বদিক দিয়া বিশ্বস্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য বলা যাইতে পারে। বিশ্বস্ত বলা যায় তাকে যার আগে থেকে কোরআনের এবং হাদীছের বিরুদ্ধে মতবাদ না আছে এবং বিশ্বাসযোগ্য বলা যায় তাকে যার সব দিক দিয়া পূর্ণ জ্ঞান ও যোগ্যতা আছে—যিনি চৌদ্দশ' বছর আগের ভাষায় লিখিত মূল বিষয়টি নিজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বর্তমান যুগের মানুষের ভাষায় অবিকলরূপে যেমনটি তেমন বুঝাইয়া হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারেন।

প্রায় দশ বৎসর আগে আমি বোখারী শরীফের বাংলা অনুবাদের জন্য একটি ভূমিকা লিখিয়া ছিলাম, কিন্তু বোখারী শরীফের তরজমার কাজে হাত দিতে সাহস করি নাই। দেশের ও জাতির চাহিদা অতি বেশী, প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক, সে জন্য বারবার মনে ব্যথা পাইয়াছি, কিন্তু সাহস পাই নাই। ক্ষুধার্ত যদি সুখাদ্য না পায়, তবে শেষে অখাদ্য-কুখাদ্য খাইয়াও ক্ষুধা নিবৃত্ত করে।

আর দুনিয়াতে একদল লোক যে কুখাস্ত লইয়া বসিয়াও আছে—এই ভাবনায় মনে মনে বহুবার ব্যথিত হইয়াছি, তাহা সত্বেও এত বড় বিশাল সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার ন্যায় কাজে হাত দিতে সাহস পাই নাই।

আল্লাহ দর্জা বলন্দ করিয়া দিন আমার পরম দোস্ত মওলানা আজিজুল হক সাহেবের যে, তিনি এত বড় বিরাট কাজে হাত দিতে সাহস করিয়াছেন। তিনি জওয়ানে ছালেহ্—তিনি বাস্তবিকই এই কাজের যোগ্যতা রাখেন। যতদূর আমার জানা আছে—বোখারী শরীফ বর্তমান যুগে বাংলাদেশে তাঁহার চেয়ে অধিক যত্নসহকারে এবং আদ্যোপান্ত বুঝিয়া আর কেহ পড়েন নাই এবং বোখারী শরীফের খেদমতও এতদূর কেহ করেন নাই। তিনি হযরত শায়খুল ইসলাম মওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী রহমতুল্লাহে আলাইহের খাছোল-খাছ শাগের্দ। পড়ার জামানাতেই তিনি ১৮০০ পৃষ্ঠাব্যাপী শরাহ উর্দু ভাষায় লিখিয়াছেন। স্বয়ং হযরত শায়খুল ইসলাম তাঁহার লেখা সঙ্গে সঙ্গে আদ্যোপান্ত দেখিয়াছেন, আনন্দিত হইয়াছেন এবং প্রশংসা করিয়াছেন। (বর্তমানে উহা পাকিস্তানে ছাপা হইয়াছে।) বোখারী শরীফ পড়ার পরও প্রায় এক বৎসর হযরত শায়খুল ইসলামের খেদমতে থাকিয়া এছ্লাহে-নফছ ও তজকিয়ায়ে-বাতেনের কাজে লিপ্ত ছিলেন এবং বোখারী শরীফের শরাহ লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার যোগ্যতায় এবং বিশ্বস্ততায় কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অতঃপর কয়েকবার বোখারী শরীফ এবং অন্যান্য ছেহাহ্-ছেত্তা হাদীছের কেতাব দরছ দেওয়ার পর যখন বাংলাদেশের অভাব মিটানোর জন্য বোখারী শরীফের বাংলা অনুবাদ করা তিনি শুরু করিয়াছেন তখন আমার খুশীর আর সীমা রহে নাই।

আল্লার শোকর করিয়াছি, মক্কা শরীফে গিয়া—হাতীমে, মাতাফে, মাকামে-ইব্রাহীমে দোয়া করিয়াছি, মদীনা শরীফে রওজা পাকে দাঁড়াইয়া দোয়া করিয়াছি—এই বিরাট খেদমত আল্লাহ পাক তাঁহার দ্বারা নিন: বাংলার মুসলমানের জরুরত মিটান। মওলানা আজিজুল হক সাহেব লিখিয়া লিখিয়া আমাকে দেখাইয়াছেন: অনেক জায়গা আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছি, অনেক জায়গা দেখিয়া কিছু কিছু সংশোধন তাঁহার দ্বারাই করাইয়াছি। আল্লাহ পাক তাঁহার দর্জা বলন্দ করুন, কবুল করুন, পাঠকগণকে ইহা হইতে ফয়েজ দান করুন, ইহ-পরকালের ভাল করুন—আমি গোনাগার আল্লাহ পাকের মহান দরবারে করুন-সুরে দোয়া করি। আমীন! ছোম্মা আমীন!!

10-6-57

بسم الله الرحمن الرحيم

গুজারেশ

অনেক সময় দেখা যায়, জ্ঞান চর্চ্চায় উপযুক্ত এবং সেই আখড়ার বীর পুরুষগণও নিজেদের অক্ষমতা ও নগণ্যতা প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ কোন মহা মনীষীর পক্ষেও এইরূপ করা অতিরিক্ত গণ্য হইবে না, কারণ জ্ঞান-সমুদ্র এতই সুগভীর, বিশাল ও সুপ্রশস্ত যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য যে কোন বীরের বীরত্ব ও মহানের মহত্ব এই অথই সমুদ্রে খড়-কুটার ন্যায়ই বটে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন— وما اوتيتم من العلم الا قليلا "মানবকে জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে মাত্র যৎকিঞ্চিতই দান করা হইয়াছে।"

কিন্তু উপযুক্ত ও মহান ব্যক্তিগণ কর্তৃক নগণ্যতা প্রকাশের রীতি বিদ্যমান থাকায় প্রকৃত অনুপযুক্ত, ত্রুটিপূর্ণ ও বাস্তবে নগণ্য ব্যক্তিদের বেলায় সমস্যার উদ্ভব হয় যে, তাহারা কিরূপে স্বীয় বাস্তব নগণ্যতা প্রকাশ করিবে? ভাষায় প্রকাশ করা নিষ্ফল; কারণ, মানুষ হিসাবে যতটুকু পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানী হওয়া সম্ভবপর উহার অধিকারীগণও নগণ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সমস্যায়ই আমি আমার বাস্তব নগণ্যতাকে প্রকাশ করিতে ভাষার আশ্রয় বিফল বিবেচনা করিলাম।

তদুপরি পাঠকদের সম্মুখে আমার অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানের ঝুলি ছড়ান থাকিল। উহা যে, কি সমস্ত কানাকড়ি ও অচল বস্তুসমূহের সমবায়, তাহা আপনা-আপনিই প্রকাশ পাইতে থাকিবে।

মহাগ্রন্থ বোখারী শরীফ বিশ্ববাসীর অন্তরে যে উচ্চাসন লাভ করিয়া আছে, উহা তাহার বাস্তব মর্য্যাদার কিয়দাংশ মাত্র। কিন্তু আমি অধমের জ্ঞানবিন্দু যে, সেই কিয়দাংশের মর্য্যাদানুপাতিক পিপাসাটুকু মিটাইতে কোন সাহায্য করিতে পারে না তাহা অতি সুস্পষ্ট। এমতাবস্থায় নরাধমের পক্ষে বোখারী শরীফ অনুবাদের কাজে হাত দেওয়া "মন্ত্র না জানিয়া সাপের গর্ত্তে হাত দেওয়া" এরই শামিল। এই সমস্ত জানিয়া-বুঝিয়াও আমি একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করিয়াই এই সুমহান কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। রহমতে-ইলাহীর দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত। তদুপরি আল্লাহ পাক এমন কতিপয় মহামনীষীর অছীলা আমাকে প্রদান করিয়াছেন যাঁহারা এই ময়দানের দার্শনিক এবং অপরাজেয় বীরপুরুষ।

তন্মধ্যে একজন—শায়খুল ইসলাম মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রঃ)। তাঁহার নিকট বোখারী শরীফ অধ্যয়নের বাসনায় আমি বঙ্গদেশ হইতে সুদূর বোম্বাইর নিকটবর্তী ডাভেলস্থ ইসলামিয়া মাদ্রাসায় ছুটিয়া যাই; এক বৎসর তাঁহার খেদমতে অধ্যয়নের সৌভাগ্য লাভ হয়। তাঁহার অতুলনীয় জ্ঞান-সূর্য্যের কিরণমালার প্রতি দৃষ্টিপাতের শক্তি আমাদের কোথায় ছিল?

তবে তাঁহার অধ্যাপনার সময় তাঁহার বর্ণিত তথ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ও অমূল্য বর্ণনাসমূহকে আমি সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং পরবর্তী বৎসর দেওবন্দস্থিত তাঁহার বাসভবনে তাঁহারই ছোহবতে থাকিয়া ঐ পাণ্ডুলিপির পুনর্লিখন কার্য্য সমাধা করি। এইরূপ সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বয়ং উহার সংশোধন করতঃ পূর্ণভাবে দেখিয়া যাইতেন। তাঁহারই প্রদত্ত মণি-মুক্তা সমূহ যথারীতি সুবিন্যস্ত দেখিয়া তিনি পরম আনন্দ অনুভব করিতেন এবং উহার একটি নকল নিজ হেফাজতে রাখিবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। শায়খুল ইসলামের মহান ব্যক্তিত্বের পরিচয় দানের চেষ্টা করা দ্বিপ্রহরে সূর্য্যের পরিচয় দেওয়ার সমতুল্য। তাঁহার সঙ্কলিত

মোসলেম শরীফের শরাহ, পবিত্র কোরআনের তফছীর এবং অন্যান্য অমূল্য সঙ্কলন সমূহ ব্যতীত তাঁহার স্বনামখ্যাত বিরাট ব্যক্তিত্বই তাঁহার পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট।

শায়খুল ইসলাম (রঃ)-এর নিকট বোখারী শরীফের অধ্যয়ন আমার জন্য এই মহান কিতাবের দ্বিতীয়বার অধ্যয়ন ছিল। এর পূর্বের বৎসর আমি প্রখ্যাত আলেমকুল শিরোমণি মওলানা জাফর আহমদ ওসমানী (রঃ)-এর নিকট অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। তিনি যে কত বড় বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী তাহা তাঁহার এই যুগের অদ্বিতীয় গ্রন্থ "এ'লাউন-সুনান"-এর ন্যায় হাদীছের মহান কিতাব দেখিলেই অনুমান করা যায়। এতদ্ব্যতীত শুধু পাক-ভারতেই নহে, বরং মুসলিম জাহানে তিনি এতই সুপরিচিত যে, আমি তাঁহার সম্বন্ধে যত কিছু লিখিব তাহা রেশমের জামায় চটের তালিরূপেই পরিগণিত হইবে।

তদুপরি অনুবাদ কার্য্যের যাঁহার অতুলনীয় দান, সাহায্য ও সক্রিয় সহায়তা বিশেষরূপে লাভ করিয়াছি তিনি হইলেন ইসলামী চিন্তাধারার অদ্বিতীয় চিন্তানায়ক ও স্বনামখ্যাত মোর্শেদ-কামেল মওলানা শামছুল হক (রঃ), যিনি আমার রুহানী পিতা এবং আমার অদ্বিতীয় মুরব্বী। বাল্যকাল হইতেই আমি তাঁহার স্নেহ-শীলত ছায়াতলে প্রতিপালিত হইয়াছি। তাঁহার পরিচয় বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে প্রতিটি ধর্মভীরু মানুষের অন্তরেই রহিয়াছে। তাঁহার অসাধারণ মহিমা ও ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক গ্রন্থসমূহ এবং তাঁহার শাগের্দান সারা বাংলা পরিবেষ্টিত করিয়া আছে।

বোখারী শরীফ অনুবাদের মহান কার্য্য একমাত্র তাঁহার ফয়েজ ও বরকতের অছিলায়ই সম্ভব হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়—ঈমান ও দ্বিতীয় অধ্যায়—এল্‌ম প্রায় সম্পূর্ণই তাঁহার দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছে। অপরাপর অধ্যায়েও তাঁহার এইরূপ দান রহিয়াছে যে, বস্তুতঃ এই অনুবাদকে কলমের ন্যায় আমার হাতে তাঁহারই অবদান বলা চলে। অনুবাদ কার্য্যে যাহা কিছু কৃতিত্ব রহিয়াছে উহার সবটুকু তাঁহারই ফয়েজ। ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সবটুকুই এই নরাধমের অজ্ঞতা ও অযোগ্যতা প্রসূত। আমার দ্বারা কোন ত্রুটিবিহীন বিষয়বস্তু প্রকাশ পাইয়া থাকিলে তাহা তাঁহারই দোয়ার ফল।

মানুষ মাত্রেরই ভুল-ত্রুটি স্বাভাবিক। আমার ন্যায় নালায়েকের পক্ষে তাহা অবশ্যম্ভাবী। পাঠক-পাঠিকা বিশেষভাবে পণ্ডিতবর্গ এবং আলেমকুলের প্রতি অনুরোধ—ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হইলে আমাকে অবহিত করিয়া অশেষ ছওয়াবের ভাগী হইবেন; আমি উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হইব।

পাঠকবর্গের খেদমতে আমার সর্বশেষ আরজ—এই অনুবাদ কার্য্য চলাকালীন আমার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। আমার পিতা শ্রদ্ধাভাজন মরহুম হাজী এরশাদ আলী আমার এই কাজের প্রতি সবিশেষ আগ্রহশীল ও অনুরাগী ছিলেন। আমাকে দীনের এল্‌ম শিক্ষাদানে তিনি অতিশয় যত্ন নিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তিম শয্যায় আমি এই কার্য্যের ছওয়াব ও সুফল লাভের বড় অংশীদার রূপে তাঁহাকে বহু আশা দিয়া থাকিতাম। আপনারা দোয়া করিবেন, আল্লাহ তায়ালা আমার আব্বাকে জান্নাতবাসী করেন এবং দয়ার দরিয়া মাবুদ আমাকে যেই কার্য্যের তৌফিক দান করিয়াছেন সেই কার্য্যের চেষ্টাকে কবুল করিয়া আমার আব্বা ও আম্মার রূহকে ইহার ছওয়াব পৌঁছাইয়া দেন। হে আল্লাহ! তোমারই অপার রহমতে এই নরাধমের দ্বারা যাহা কিছু চেষ্টা-সাধ্য সম্ভবপর হইয়াছে, তুমি স্বীয় করুণাবলে উহাকে কবুল কর। আমীন!

পবিত্র হজ্জের সফরে,
চট্টগ্রাম—১৫।৬।৭৭ ইং,

আরজ-গুজার
আজিজুল হক

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বোখারী শরীফের অধিকাংশ হাদীছের এক একটি হাদীছ একাধিক—৫।১০ জায়গায় বর্ণিত আছে। কারণ, এক একটি হাদীছে বিভিন্ন অধ্যায়ের বিভিন্ন মছআলাহ থাকে; সে সূত্রে বিভিন্ন অধ্যায়ের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে একটি হাদীছই বিভিন্ন ছনদে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ হইয়াছে। সেমতেই আড়াই হাজার মূল হাদীছ প্রায় আট হাজারে পরিণত হইয়াছে। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইহাও যে, স্থানের বিভিন্নতায় একটি হাদীছের অংশাবলীর মধ্যেও বিচ্ছিন্নতা আসিয়াছে। সমুদয় স্থান হইতে মূল হাদীছটির বাক্যাবলী একত্রিত করিলে উহার কলেবর যাহা দাঁড়ায় সেই কলেবর একত্রে বোখারী শরীফের এক স্থানে পাওয়া বিরল। কিন্তু অনুবাদের সৌন্দর্য্য এবং পাঠকের পক্ষে অধিক উপকারী ব্যবস্থা একমাত্র ইহাই যে, প্রতিটি হাদীছ উহার সমুদয় অংশ সম্বলিতরূপে একত্রিত আকারে অনুদিত হয়। কিন্তু বার শত পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ গ্রন্থে ২, ৪, ১০, ২০ স্থানে বিক্ষিপ্তরূপে পুনঃ পুনঃ বর্ণিত এক একটি হাদীছের বিভিন্ন অংশ খুঁজিয়া বাহির করা কতই না কঠিন। এই নরাধমের জন্য ত অসম্ভব। আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত—এমন একখানা কেতাব আমার হস্তগত হয় যাহাতে ঐরূপ প্রতিটি হাদীছের প্রত্যেকটি স্থান নিরূপণ ও পৃষ্ঠার সংখ্যা নির্ণয় করা হইয়াছে; এই বিষয়েই কেতাবখানা রচিত। ঐ কেতাবখানা ব্যতিরেকে বোখারী শরীফ অনুবাদের সৌন্দর্য্য সাধন এই যুগে সম্ভব নহে। ঐ কেতাবের রচয়িতা শেখ আবদুল আজিজ (রঃ)। পাঠকদের নিকট বিশেষ অনুরোধ, সকলে তাঁহার জন্য ফেরদাউস-বেহেশতের দোয়া করিবেন।

অত্র আলোচনা দৃষ্টে ইহা সুস্পষ্ট যে, যেই পরিচ্ছেদে যেই হাদীছ অনুদিত আছে মূল গ্রন্থের সেই পরিচ্ছেদে উল্লেখিত উক্ত হাদীছের অনুবাদে অতিরিক্ত বাক্যাবলী বা বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে বন্ধনী না থাকিলে মনে করিবেন—এই বাক্য বা অংশ মূল গ্রন্থের কোন স্থানে নিশ্চয় উল্লেখ আছে।

আরজ-গুজার

আজিজুল হক

পরম সম্পদ

ছাইয়্যেদী ছনদী মওলানা শামছুল হক (রঃ) ১৯৫৬ সনে হজ্জ করিতে যান। সেই বৎসরই রমযান মাসে বোখারী শরীফ অনুবাদের কাজ নরাধমের হাতে আরম্ভ হয়। চরম ও পরম সৌভাগ্য যে, তিনি হজ্জ উপলক্ষে পবিত্র মক্কা-মদীনায় দোয়া কবুল হওয়ার প্রত্যেক স্থানেই এ বিষয়ে নরাধমের জন্য দোয়া করিয়াছিলেন এবং লিখিত অনেক কিছু আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে—তাঁহার পবিত্র মসজিদের বিশিষ্ট স্থানে বসিয়া তাহাজ্জুদের সময় তিনি যে দোয়া করিয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে তাহা লিখিতরূপে পাইয়াছি। ইহা আমার নিকট নিঃসন্দেহে কএঅতুলনীয় পরম সম্পদবিশেষ। তাই বরকতের জন্য নিম্নে উহারই ফটো ব্লক দেওয়া হইল।

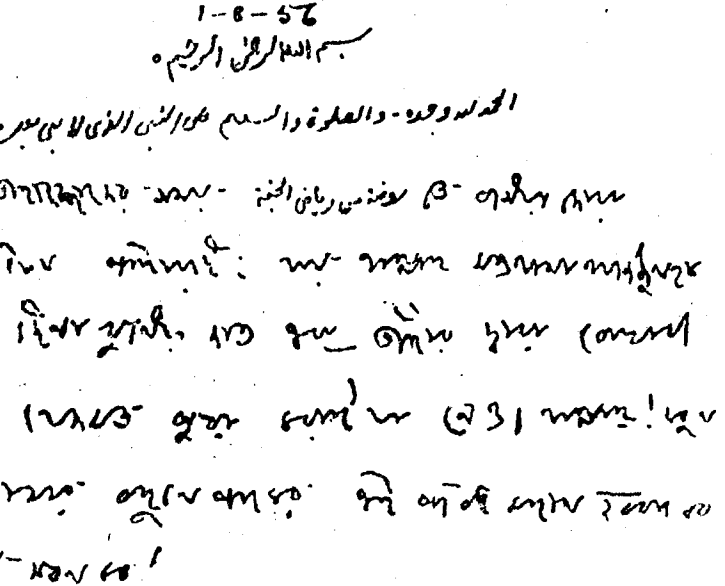

মুখবন্ধ

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবের সময় হইতেই জগদ্বাসীর এক বিরাট অংশ তাঁহার আলো ও নূরে-হেদায়েত হইতে বঞ্চিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি আস্থাহীন রহিয়াছে। তাহাদের এই অনাস্থা বিস্ময়ের কিছু নহে। কারণ তাহারা কাফের তাহারা ইসলামের দাবীদার নয়; অতএব তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর তথা তাঁহার আদর্শ ও তাঁহার বাণীর প্রতি আস্থাবান হইবে কেন? কিন্তু যাহারা মুসলমান হওয়ার দাবীদার —যাহারা আল্লার উপর, কোরআনের উপর, আল্লার রসুলের উপর ঈমান রাখার দাবী করিয়া থাকে এবং "আশহাদু-আন্না মোহাম্মাদার রসুলুল্লাহ" কলেমা পড়িয়া মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সত্য রসুলরূপে গ্রহণ করিয়া লইয়াছে, তাহারা তাঁহার আদর্শ ও সুন্নাত তথা তাঁহার বাণী ও হাদীছকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করিতে পারে না।

হাদীছ তথা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শ ও বাণীরূপে যে জ্ঞান-ভাণ্ডার চৌদ্দশত বৎসর হইতে বিশ্বব্যাপী মোসলেম জাতির মধ্যে বিরাজ করিতেছে সেই অমূল্য রত্নকে নানা ছলে-বলে ও অপকৌশলে এনকার ও অস্বীকার করার ব্যর্থ চেষ্টা করা অযৌক্তিক বৈ নহে? মোসলেম জাতি যে যুগে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত ছিল, যখন তাহাদের গুণ ও জ্ঞান বিশ্বজয়ী ছিল এবং যে যুগ ধর্মীয় বিষয়ে সর্বাধিক উজ্জ্বল যুগ ছিল সেই সোনালী যুগে এরূপ কোন উক্তির আভাষ কোথাও পাওয়া যায় নাই। ধর্মীয় আকর্ষণ ও জ্ঞান-মর্য্যাদার দুর্বলতম—বর্তমান যুগে ঐধরণের কোন উক্তি শুনা গেলে তাহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক ও অনুতাপের যোগ্য হইবে এবং উহাকে মোসলেম সমাজের মধ্যে অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ ও সমাজ দেহে এক ব্যধির প্রাদুর্ভাব বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ক্ষেত-খামার যখন শস্য-শ্যামল না থাকে তখনই উহার মধ্যে অবাঞ্ছিত আগাছাসমূহ আপনা-আপনিই মাথা চাড়া দিয়া উঠে এবং মানব দেহ যখন জীবনীশক্তি ও শোধিত রক্ত হারাইয়া ফেলে তখনই উহাতে খোস-পাঁচড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

আল্লাহ তায়ালা আ'লেমুল গায়েব—তিনি পূর্ব হইতে সব কিছু অবগত আছেন; তাঁহার পক্ষ হইতে জ্ঞাত হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করতঃ এ সব অবাঞ্ছিত মনোভাবের মুখোশ খুলিয়া দিয়া স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। যথা—

أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ كَمَا حَرَّمَ اللّٰهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ .....

অর্থাৎ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—হে মুসলমান! সতর্ক থাকিও; সেই যুগ দূরে নহে যেই যুগে এমন সব লোকের আবির্ভাব হইবে যাহারা গোঁপে তেল মাখিয়া

তোমাদের মধ্যে প্রচারণা চালাইবে যে—কোরআন শরীফের মধ্যে যতটুকু হালাল-হারাম উল্লেখ আছে, ততটুকুর উপরই আমল কর। (নবী (দঃ) বলেন—)

হুশিয়ার। আমি সতর্ক করিয়া যাইতেছি—তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া-বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখ যে—আল্লার রসুল অর্থাৎ আমি যে বস্তুকে হারাম বলিয়া ঘোষণা করিব উহাও ঐরূপ হারামই গণ্য যাহার হারাম হওয়ার ঘোষণা কোরআন শরীফে আছে। (কোরআন আল্লার বাণী এবং রসুল যাহা বলিবেন তাহাও স্বয়ং আল্লার তরফ হইতেই অহী মারফৎ প্রাপ্ত। যেমন,) আমি ঘোষণা দিতেছি, গৃহ পালিত গাধা এবং হিংস্র জন্তু (খাওয়া) হারাম (আবু দাউদ শরীফ)। এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ও সতর্কবাণীর হাদীছ আরও অনেক আছে।

দুনিয়ার বিলুপ্তি বা কেয়ামত যতই নিকটবর্তী হইতেছে, আল্লাহ ও আল্লার রসুলের ভবিষ্যদ্বাণী এক একটি করিয়া বাস্তবায়িত হইতেছে। তাই মোমেন-মোসলেম ব্যক্তি মাত্রই সর্বদা সতর্ক থাকিবে; যখনই এরূপ কোন ছলনাময়ী উক্তি শুনিবে যে—কোরআন শরীফে যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট তাহাই মানিয়া চলিব; হাদীছ (নামে যেই জ্ঞান-ভাণ্ডার চৌদ্দশত বৎসর হইতে প্রচলিত তাহা) মানিতে প্রস্তুত নহি ইত্যাদি, তখনই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করতঃ ঐ প্ররোচনা হইতে দূরে থাকিবে।

কোরআন মানিয়া চলার ধুয়া তুলিয়া বা যুক্তির ভাওতা দিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর হাদীছ অস্বীকার করা বস্তুতঃ কোরআনের বিরোধিতা ও যুক্তির অবমাননাই বটে।

সংক্ষেপে কোরআন শরীফের কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত হইতেছে এবং সরল যুক্তির কয়েকটি ধারা বর্ণিত হইতেছে, যদ্বারা হাদীছ নামে প্রচলিত জ্ঞান-ভাণ্ডারের অপরিহার্যতা এবং নির্ভরশীলতা প্রমাণিত হইবে। সুধীগণ সুষ্ঠু পরিবেশে নির্মল মস্তিষ্কে চিন্তা করিবেন ইহাই আশা।

وما علينا الا البلاغ "আমাদের কর্তব্য—খাঁটী কথা পৌঁছাইয়া দেওয়া।"

হাদীছ কাহাকে বলে: রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যাহা বলিয়াছেন বা করিয়াছেন এবং যে বিষয়ের প্রতি তাঁহার সমর্থন পাওয়া গিয়াছে, উহাকে হাদীছ বলে।

হাদীছের মর্য্যাদা: হাদীছের মর্য্যাদা নির্ণয় করা আল্লার রসুল বা পয়গাম্বরের মর্য্যাদা উপলব্ধি করার উপর নির্ভর করে। পয়গাম্বর কে হন? তাঁহার মর্তবা কত উর্দ্ধে? এসব প্রশ্ন এত জটিল যে, ইহা বুঝিতে সুষ্ঠু ও পবিত্র মস্তিষ্কের এবং গভীর ও প্রশস্ত জ্ঞানের প্রয়োজন।

রসুল বা নবীর মর্তবা: মানুষকে আল্লাহ তায়ালা এত কর্মক্ষমতা ও উন্নতির শক্তি দান করিয়াছেন যে, সেই শক্তি সৃষ্টিকর্তা আল্লার তুলনায় সামান্য ও সীমাবদ্ধ হইলেও উহা এত ব্যাপক যে, উহাকে ব্যাপকতার দিক দিয়া পর্য্যাপ্ত বরং অসীম তুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সেই পর্য্যাপ্ত শক্তি বলে মানুষ বিরামহীন পরিশ্রমের দ্বারা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছিতে পারে, উচ্চ দরের বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক ও সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক হইতে পারে। এমনকি খাঁটী ও একনিষ্ঠ সাধনার সঙ্গে সঙ্গে যদি বিশ্বস্রষ্ঠা—সারা জগতের আলো, জ্ঞান ও শক্তির মালিক আল্লাহ তায়ালার সহিত তাঁহার জেকর, তায়া'ত এবং স্মৃতি-ভক্তি ও আনুগত্যের দ্বারা দৃঢ় গোপনসূত্র স্থাপন করিয়া লওয়া যায় তবে মানুষ "বেলায়েতের" এবং মা'রেফাতের তথা আল্লার ওলী হওয়ার মর্তবায় পৌঁছিতে পারে। আল্লার ওলীর মর্তবা অনেক উর্দ্ধে। এই মা'রেফাত ও বেলায়েতের মধ্যেও আবার অনেকগুলি স্তর আছে। এক একটি স্তর অন্যটি হইতে এত উর্দ্ধে অবস্থিত যে, তাহা অনুভূতি ব্যতিরেকে শুধু ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ওলীর দর্জা হইতে বহু উর্দ্ধে শহীদ ও ছিদ্দিকের দর্জা। ওলী, শহীদ,

ছিদ্দিক এসবের দর্জা বহু উর্দ্ধে হইলেও ইহা মানুষের সাধনার মাধ্যমে হাসিল হইয়া থাকে। এই সব মানুষের আয়ত্তের বাহিরে নয়।

কিন্তু নবুওতের মর্তবা এত উর্দ্ধে যে, তাহা ওলী, শহীদ, ছিদ্দিক সকলেরই নাগালের বাহিরে। কেহই সাধনার বলে নবুওত পাইতে পারে না। নবী একমাত্র আল্লার রহমতেই নবুওত পাইয়া থাকেন, সাধনায় উহা অর্জিত হয় না; অবশ্য উহার জন্য এবং উহা রক্ষণের জন্য ও উহার হক আদায় করার জন্য বিরামহীনরূপে সর্বাধিক কঠোর সাধনার প্রয়োন হয়।

নবী ও রসুলের জ্ঞান সর্ব উর্দ্ধে: বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ওলী ও নবীগণের দর্জা ও মর্তবার ব্যবধান অনুযায়ী তাঁহাদের জ্ঞানের মধ্যেও ব্যবধান আছে। বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদের জ্ঞান হইতেছে শুধু কল্পনা ও যুক্তির জ্ঞান; সেই জন্যই উহাতে সত্যতা থাকিলেও সঙ্গে সঙ্গে বহু ভুল এবং অসত্যও থাকিয়া যায়। ওলীদের জ্ঞান তার চেয়ে উর্দ্ধে; কারণ তাঁহাদের জ্ঞান কল্পনা ও যুক্তির জ্ঞান নহে, বরং সমস্ত জ্ঞানের আকরের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে আহরিত জ্ঞান। কিন্তু তাঁহাদের সেই জ্ঞান অহরণের পথ পূর্ণ পরিষ্কার পরিপক্ক ও সুরক্ষিত নয়, তাই তাঁহাদের জ্ঞানের মধ্যেও অতিক্রম ব্যতিক্রম হইতে পারে। কিন্তু নবীদের জ্ঞান আল্লার নিকট হইতে সরাসরি প্রাপ্ত অহীর জ্ঞান—উহাতে কোন দিক দিয়াই সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে না।

হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর জ্ঞান সর্ব উর্দ্ধে: নবীদের মধ্যেও বিভিন্ন মর্তবা বিদ্যমান আছে: স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ "আমি রসুলগণের মধ্যে একজনকে অপরজনের উপর বিশেষ মর্য্যাদা দান করিয়াছি।" সর্ব উর্দ্ধে হইলেন আমাদের নবী মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম। তাঁহার সমন্ধে আল্লাহ তায়ালাই এই সাক্ষ্য দিতেছেন—وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ অর্থাৎ মোহাম্মদ (দঃ) একটি কথাও নিজের তরফ হইতে বা কল্পনা হইতে বলেন না; আমি যাহা বলিয়া দেই ঠিক অবিকল তাহাই তিনি বলেন। এই বিষয়টি মওলানা রুমী (রঃ) এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—

گفتۂ او گفتۂ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

"আল্লাহ তায়ালার বক্তব্যই ঠিক ঠিক অবিকলরূপে রসুলের কণ্ঠে প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

সর্বশক্তিমান মহাপরাক্রমশালী জলীল ও জব্বার আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ.....

অর্থাৎ যদি সে (মোহাম্মদ (দঃ)) কোন একটি কথাও নিজের তরফ হইতে বানাইয়া বলিত তবে আমার সর্বগ্রাসী হস্তে তাহাকে ধরিয়া যখন তখন তাহার হৃদয়তন্ত্রীকে ছিঁড়িয়া দিতাম।

অহীর পরিপক্কতা: নবীদের জ্ঞান-প্রাপ্তির সূত্র ও পথ হইল অহী। অহীবাহক হইলেন জিব্রাঈল ফেরেশতা, যিনি আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য—কোটি কোটি ফেরেশতাদের সর্বপ্রধান চারিজনের মধ্যে প্রধানতম। সমূহ কুপ্রবৃত্তি ও অপকর্মের ইচ্ছাশক্তি হইতে পূর্ণ পবিত্ররূপে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তা ছাড়া জিব্রাঈল (আঃ) "আমীন" অর্থাৎ আল্লার আমানত বাহক বলিয়া পরিচিত। ফেরেশতাদের শক্তি সামর্থও কল্পনাতীত; বিশেষতঃ হযরত জিব্রাঈলের শক্তি। এতদসত্বেও যখন জিব্রাঈল ফেরেশতা আল্লার তরফ হইতে রসুলুল্লার প্রতি অহী বহন করিয়া আনিতেন তখন বাহিক বা স্থূল সতর্কতা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা কিরূপ হইত তাহা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন—

فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ

رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

অর্থাৎ অহী এত সুরক্ষিতরূপে এত সুবন্দোবস্তের সহিত আসে যে, আল্লাহ তায়ালা বহু সংখ্যক ফেরেশতা প্রহরীর দ্বারা আদ্যোপান্ত পাহারা নিযুক্ত করিয়া রাখেন,* (যাহাতে আল্লার প্রেরিত বিষয়বস্তুর মধ্যে শয়তান বা নফসের বিন্দুমাত্র দখল আসিতে না পারে, বিন্দুমাত্র কল্পনা বা ভুল, মিথ্যা ও ব্যতিক্রম-অতিক্রমের লেশমাত্র তার সঙ্গে মিশ্রিত হইতে না পারে। এইরূপে সুদৃঢ় রক্ষণাবেক্ষণের সহিত অহী প্রেরণের ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা করেন) যদ্দ্বারা জগদ্বাসীকে প্রমাণ করাইয়া দিতে পারেন যে—আল্লার বাণী, আল্লার অহী তাঁহারা (অহী বাহকগণ) অবিকল ঠিক ঠিকরূপে পৌছাইয়াছেন, বিন্দুমাত্র পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন উহাতে হয় নাই বা উহাতে মানুষের রচনার ও কল্পনার লেশমাত্র নাই।

এখন চিন্তা করিয়া দেখুন অহী কত সুরক্ষিত বস্তু। ইহাই হইতেছে নবীগণের আহরিত জ্ঞানের একমাত্র পথ ও সূত্র। তাই নবীর জ্ঞান, নবীর বাণী, নবীর সমস্ত কথাবার্তা এবং কার্য্যকলাপ খাঁটী ও সত্যের প্রতীক। উহাতে অখাঁটী ও অসত্যের বিন্দুমাত্র অবকাশ আসিতেই পারে না। কারণ নবী স্বয়ং নিষ্পাপ, তাঁহার প্রতিটি বাণী এবং প্রতিটি কার্য্য ও জ্ঞানের উৎস আল্লাহ তায়ালা। প্রতিটি বিষয়বস্তু আল্লার নিকট হইতে রসুলের নিকট পৌছিবার একমাত্র সূত্র অহী; তাই এক্ষেত্রে খাঁটী ও অসত্যের সম্ভাবনায় কোন ছিদ্রপথই কোথাও নাই।

কোরআন ও হাদীছের মধ্যে পার্থক্য : এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, রসুলের হাদীছও যদি অহীর মারফৎ আল্লার তরফ হইতে হইয়া থাকে তবে কোরআন ও হাদীছের মধ্যে পার্থক্য থাকে না।

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে—প্রকৃত প্রস্তাবে কোরআন ও হাদীছে পার্থক্য নাই বলা যাইতে পারে এই অর্থে যে, উভয়ই আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে অহী মারফৎ নবীকে দান করা হইয়াছে। পার্থক্য শুধু এই যে—কোরআনের অর্থ ও ভাষা (Text) উভয়ই অক্ষরে অক্ষরে অহী মারফৎ আল্লার তরফ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং জিব্রাঈল কর্তৃক পঠিত হইয়াছে, তাই কোরআনের আয়াত ও বাক্য নামাযে তেলাওয়াত করা হয় এবং ইহাকে "অহী মত্‌লু" ও আল্লার কালাম বলা হয়। হাদীছের অর্থ ও বিষয়বস্তু আল্লার তরফ হইতে অহী মারফৎ প্রাপ্ত বটে, কিন্তু উহার শব্দ ও বাক্য রসুলের রচিত। কোরআন-হাদীছের আসল উৎস একই। তাই কোরআন আল্লার বাণী যেমন নির্ভুল, হাদীছও তদ্রূপ নির্ভুল। ইহাতে সন্দেহ নাই।

অবশ্য যাহারা রসুলের সেই বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে তাহাদের মধ্যে পরবর্তী যুগীয় কোন বহনকারীর দ্বারা কৃত্রিম বা মিথ্যা রচনার সন্দেহ থাকিতে পারে বটে। সেই জন্যই হাদীছবিশারদ

---

* আল্লাহ সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ; তাঁহার জন্য কোন কিছু ব্যবস্থারই আবশ্যক হয় না। কিন্তু মানুষ স্থূলজগতে বাস করে; তাহাদের দৃষ্টি বাহ্যিক ও স্থূল ব্যবস্থাদির প্রতিই ধাবিত ও নিবদ্ধ হইয়া থাকে। এই জন্য জগদ্বাসীর ভাবধারা ও ভঙ্গিমার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা এসব ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং উহা তাহাদেরই রুচিসম্মত বলিয়া প্রকাশও করিয়া দেন। নতুবা স্বয়ং কাদেরে মোত্‌লাক, আহকামুল-হাকেমীন আল্লাহ এ সবের প্রত্যাশী মোটেই নহেন।

মোহাদ্দেছগণ জাল ও কৃত্রিম সন্দেহের হাদীছগুলি বাছিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন এবং সত্য ও শুদ্ধ হাদীছসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন।

রসুলের পায়রবী তথা হাদীছের অনুসরণ অপরিহার্য্য প্রমাণে পবিত্র কোরআন ঃ

কোরআন শরীফের অসংখ্য আয়াত দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণিত। কতিপয় আয়াত এই—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (১)

অর্থ :—হে মোসলমান জাতি! রসুলুল্লার জীবনের মধ্যে—তাঁহার প্রতিটি কথা ও কাজের মধ্যে তোমাদের জন্য সুন্দর নমুনা ও আদর্শ নিহিত রহিয়াছে;

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তায়ালা মানবকে বহু আদেশ-নিষেধের বেষ্টনীর মধ্যে তাহার উপর এই গুরুদায়িত্ব চাপাইয়া দিয়াছেন যে, সে যেন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালাকে সর্বদা সন্তুষ্ট ও রাযী রাখিয়া জীবন-যাপন করে। মানব যাহাতে এই গুরুদায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করিতে পারে সে জন্য আল্লাহ তায়ালা বহু ব্যবস্থাই করিয়াছেন' এমনকি নমুনাও পাঠাইয়াছেন যে, তোমরা এই নমুনার তৈরী ও গঠিত হও তবেই আমার সন্তুষ্টি লাভ করিবে। ইহা ধ্রুব সত্য যে—ফরমাইশ দাতার নমুনাকে উপেক্ষা করিলে তাহাকে সন্তুষ্ট করা দূরের কথা উপেক্ষাকারী অমার্জনীয়, দোষী ও শাস্তির উপযুক্ত হইবে। শেষ যুগে আল্লার সেই মনোনীত নমুনা হইলেন মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এবং যেরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা কোন যুগ, কাল বা দেশ ও জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নহেন, তদ্রূপ মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)ও কাল, যুগ, দেশ ও জাতি নির্বিশেষে কেয়ামত পর্য্যন্ত সকলের জন্যই আল্লার মনোনীত নমুনা।

মানুষ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করিতে চাহিলে তাহাকে ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাজিক জীবনে এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আল্লাহ-প্রদত্ত নমুনা তথা রসুলের আদর্শে স্বীয় জীবনকে গঠন ও পরিচালিত করিতে হইবে—যাহা একমাত্র হাদীছের মাধ্যমেই পাওয়া যাইতে পরে। হাদীছ-ভাণ্ডার গৃহীত না হইলে আয়াতের মর্ম বৃথা প্রতিপন্ন হইবে।

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ (২)

অর্থ—তোমরা আল্লার আদেশ পালন কর এবং রসুলের আদেশ পালন কর।

কোরআনের বহু আয়াতেই আল্লার আনুগত্য ও তাঁহার আদেশাবলীর অনুসরণের তাকিদ দেওয়া হইয়াছে এবং প্রত্যেক স্থানেই ঐ সঙ্গে রসুলুল্লার আনুগত্য ও অনুসরণের উপর সমপরিমাণ জোর দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং মানব কল্যাণের জন্য উভয়টি একই পর্য্যায়ভুক্ত।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا (৩)

অর্থ—যে ব্যক্তি আল্লার ও তাঁহার রসুলের আনুগত্য ও অনুসরণ অবলম্বন করিবে সে-ই অতি মহান কামিয়াবি ও সাফল্যের অধিকারী হইবে।

اطاعت! এতাআ'ত অর্থ অনুসরণ করা; এই একটি শব্দই আল্লাহ ও আল্লার রসুল উভয়ের সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব যেমন আল্লার এতাআ'তের অর্থ কোরআনের অনুসরণ এবং উহা কেয়ামত পর্য্যন্ত প্রত্যেকের কর্তব্য, তেমনি রসুলের এতাআ'তের অর্থ হাদীছের অনুসরণ এবং ইহাও কেয়ামত পর্য্যন্ত প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য্য কর্তব্য।

(৪) قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থ—হে মোহাম্মদ (দঃ)। আপনি আমার পক্ষ হইতে স্পষ্ট ঘোষণা শুনাইয়া দিন যে—হে মানব। তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসার (ও তাঁহাকে সন্তুষ্ট করায় সচেষ্ট বলিয়া) দাবী করিতে চাও, তবে তোমরা আমার অনুসরণ করিয়া চল, তাহা হইলে (তোমরা আশাতীত সাফল্য অর্জন করিতে পারিবে যে—) স্বয়ং আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।

স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইতেছে যে—আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিভাজন হওয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণের উপর সম্যকরূপে নির্ভর করে।

(৫) وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

অর্থ—রসুলুল্লাহ (দঃ) তোমাদিগকে যাহা আদেশরূপে দান করিয়াছেন তাহা পূর্ণরূপে মানিয়া ও গ্রহণ করিয়া লও এবং যাহা নিষেধ করিয়াছেন উহা হইতে বিরত থাক।

(৬) وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

অর্থ—হে মোহাম্মদ (দঃ)! আমি আপনাকে সমস্ত জগদ্বাসীর জন্য শান্তিবাহকরূপে পাঠাইয়াছি। (আপনার অনুসরণ ও অনুকরণে জগদ্বাসী প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারিবে।)

(৭) وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

"আমি আপনাকে সমগ্র মানবের জন্য সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রসুলরূপে পাঠাইয়াছি।"

হাদীছের অপরিহার্য্যতার যুক্তি : (১) মোসলমান মাত্রই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি ঈমান আনিতে হইবে, ইহা অবধারিত। এই ঈমানের তাৎপর্য্য কি শুধু এতটুকু বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি যে, তিনি একজন নবী ও রসুল ছিলেন? ইহা কখনও হইতে পারে না, কারণ এই বিশ্বাস ত হযরত আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর প্রতিই স্থাপন করা ইসলামের একটি মৌলিক বিষয় ও অপরিহার্য্য অঙ্গ; ইহা ব্যতীত কোন ব্যক্তিই মোসলমান হইতে পারে না। তবে মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর বিশেষত্ব কি রহিল? যে কারণে اشهد ان محمدا رسول الله মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কালেমা ইসলামের রোকন বা স্তম্ভ পরিগণিত, অথচ اشهد ان موسى رسول الله وعيسى رسول الله মূছা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণের কলেমাকে সেই মর্য্যাদা দান করা হয় নাই। তাছাড়া ইসলামের মৌলিক আকিদারূপে এবং কোরআনের অকাট্য আয়াতসমূহের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মোহাম্মদ (দঃ) স্বীয় যুগ হইতে কেয়ামত পর্যন্ত—স্থান, কাল ও জাতি নির্বিশেষে বিশ্বমানবের জন্য রসুল ও নবী; পূর্ববর্তী নবীগণ এরূপ নহেন: এই পার্থক্যের তাৎপর্য্য ও বিশ্লেষণ কি হইবে?

এই সমস্ত বিষয়ের মূলে একটিমাত্র তত্ত্ব রহিয়াছে যে—মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পূর্ণ এতা'আত এত্তেবা—অনুকরণ ও অনুসরণ কেয়ামত পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেক নাজাতকামীর জন্য অবশ্য কর্তব্য—বর্তমানে পূর্ববর্তী নবীগণের মোটামুটি সমর্থ যে, তাঁহারা আল্লার খাঁটী পয়গাম্বর ছিলেন, এতটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বেলায় শুধু এতটুকু যথেষ্ট নহে, বরং তাঁহার আদেশসমূহকে মানিয়া ও গ্রহণ করিয়া উহাকে জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রতিফলিত করার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে হইবে। আর ইহা স্পষ্টযে, হাদীছ-ভাণ্ডার গ্রহণ ব্যতিরেকে এই অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন সম্ভব নহে।

(২) শরীয়ত বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহা কোরআনের মধ্যে মুলনীতিরূপে বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু ঐসব মুলনীতিসমূহকে কার্যে পরিণত করা এবং একটি আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সব কর্মপদ্ধতি, কার্য্যধারা, নিয়ম-কানুন ইত্যাদি বিষয় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক ঐ সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রসুলের হাদীছের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে। যেমন কোরআন শরীফে নামাযের উল্লেখ আছে اقيموا الصلوة। "নামায আদায় কর।" কিন্তু নামায কত ওয়াক্ত, কোন্ কোন্ সময় কি কি পদ্ধতিতে আদায় করিতে হইবে, উহার শুদ্ধ-অশুদ্ধতার বিধি-বিধান কি কি এবং আল্লার নির্দেশিত নামায কি আকারের হইবে তাহা রসুলের বর্ণনা হাদীছেই পূর্ণরূপে জানা যাইতে পারে। তদ্রূপ কোরআন শরীকে আছে—واتوا الزكوة "যাকাত দান কর" কিন্তু কি পরিমাণ মালে কি পরিমাণ দিতে হইবে? কত দিন পর পর দিতে হইবে? তাহা একমাত্র রসুলের বর্ণনা হাদীছের মাধ্যমেই জানা যায়। এইরূপে হজ্জ ইত্যাদি ইসলামের হুকুম-আহকাম কোরআন শরীফে শুধুমাত্র মূলতঃ উল্লেখ হইয়াছে। এরূপ বিস্তারিত বিবরণ সেখানে দেওয়া হয় নাই যাহা কার্য্যক্ষেত্রে যথেষ্ট হইতে পারে। বস্তুতঃ কোরআন শরীফে বিস্তারিত ব্যাখ্যা থাকার আবশ্যকও ছিল না, কারণ নমুনা ও ব্যাখ্যাকারী রসুল সঙ্গে সঙ্গেই প্রেরিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শাহী ফরমান ও মৌলিক বিষয় সংক্ষিপ্তই হইয়া থাকে। এই জন্যই বলা হইয়া থাকে যে, হাদীছ-কোরআন হইতে ভিন্ন বস্তু নহে, বরং কোরআনেরই ব্যাখ্যা। যেমন কোরআন শরীফে ঈমানের বর্ণনা করা হইয়াছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহার আরও বিস্তারিত বিবরণ দান করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী হাদীছ বিশারদগণ ১০, ২০, ৫০, ১০০ পৃষ্ঠাব্যাপী ঐ সমস্ত হাদীছ একত্রে সংগ্রহ করিয়াছেন এবং "ঈমানের অধ্যায়" নামে নাম দিয়াছেন। এইরূপে কোরআন শরীফে অতি সংক্ষেপে নামাযের উল্লেখ হইয়াছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহার কর্মপদ্ধতি এবং কার্য্যবিধির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। ঐসব হাদীছকে একত্রে সংগ্রহ করিয়া "নামাযের অধ্যায়" নাম দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে অজুর অধ্যায়, গোছলের অধ্যায়, যাকাতের অধ্যায়, রোযার অধ্যায়, হজ্জের অধ্যায়, বিবাহের অধ্যায়, তালাকের অধ্যায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের অধ্যায়, জেহাদের অধ্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি বহু অধ্যায় হাদীছের কিতাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্তের প্রত্যেকটিরই মূলবস্তু কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে, উহারই কার্য্যপদ্ধতি ও বিস্তারিত বিবরণ হাদীছের দ্বারা দেখান হইয়াছে। বোখারী (রঃ) এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিতের উদ্দেশ্যেই প্রত্যেকটি অধ্যায়ের প্রারম্ভে ঐ বিষয় সম্বলিত কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করিয়া পরে তৎসম্বন্ধীয় হাদীছসমুহ উল্লেখ করিয়াছেন।

অধিকন্তু কোরআনের মধ্যে শত শত আয়াত এরূপ আছে যে, শুধু আমাদের উপর উহাদের মর্ম গ্রহণের ভার ছাড়িয়া দিলে সঠিকভাবে উহার উদ্দেশ্য আমাদের বোধগম্য হইত না, বরং শরীয়তের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে আমরা নিশ্চয় ভুল করিতাম। যেমন—কোরআন শরীফে আছে—فاعتزلوا النساء في المحيض "ঋতুবর্তী স্ত্রী হইতে দুরে থাক।" নিছক এই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা ইহার অর্থ এই বুঝিতাম যে, স্ত্রীদিগকে ঐ সময় সর্বপ্রকার দুরে রাখ—তাহাদের সঙ্গে আহার, নিদ্রা, উঠা-বসা কিছুই করিও না। অথচ ইসলামের বিধান ও শরীয়তের নির্দেশ এইরূপ নহে, বরং ইহা ইসলাম বিরোধী ইহুদীদের রীতি। ইহার সঠিক তত্ত্ব একমাত্র রসুলের দ্বারাই পাওয়া যাইতে পারে। তিনি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন —افعلوا كل شئ الا النكاح। "সহবাস ছাড়া আহার-নিদ্রা, উঠা-বসা ইত্যাদি সবই ঋতুবর্তী স্ত্রীর সহিত করিতে পারে।" ইহাই শরীয়তের সঠিক বিধান। কিন্তু বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রতি ইঙ্গিত করতঃ উক্ত আয়াতের শব্দগুলি ব্যাপক আকারে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোরআনের এরূপ ব্যাখ্যা একমাত্র রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ণনার সাহায্যেই পাওয়া যাইতে পারে; তাছাড়া অন্য কাহারও

এরূপ ব্যাখ্যা দিবার অধিকার নাই। আরও দেখুন, কোরআন শরীফে আছে—

ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله.....

"যাহারাই স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করিয়া রাখিবে, উহাকে আল্লার রাস্তায় খরচ না করিবে তাহাদের ভীষণ আজাব ভোগ করিতে হইবে।" এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে—কেহই স্বর্ণ-রৌপ্য জমা রাখিতে পারিবে না, প্রয়োজনাবশিষ্ট দান করিবে। অথচ ইসলামের বিধান এরূপ নহে। এই আয়াতের বাস্তব উদ্দেশ্য হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর ব্যাখ্যা দ্বারাই সাব্যস্ত হইতে পারে। তাঁহার হাদীছে প্রমাণিত আছে, ما ادى زكوته فليس بكنز "যে ধনের যাকাত দেওয়া হয় উহা উক্ত আয়াতের আওতাভুক্ত নহে।"

এই ব্যাখ্যা ছাড়া কোরআনের উদ্দেশ্য বুঝা সম্ভবই নহে এবং এই ব্যাখ্যা একমাত্র রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ণনা দ্বারাই সম্ভব, অন্য কোন উপায়ে নহে। এই জন্যই হাদীছকে কোরআনের ব্যাখ্যা বলা হয়; এই ব্যাখ্যার অপরিহার্য্যতা কেয়ামত পর্যন্ত থাকিবে।

আলোচ্য বিষয়ের আরও একটি সরল প্রমাণ এই যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কয়েকটি গুণ ও করণীয় কার্য্য প্রকাশ করতঃ বলেন—

يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة -

"আল্লাহ তায়ালা আরববাসীদের মধ্য হইতে এমন একজন রসুল পাঠাইয়াছেন যিনি তাহাদিগকে আল্লার (কালামের) আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইবেন, তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন, তাহাদিগকে আল্লার কিতাব—কোরআন এবং হেকমত তথা শরীয়ত শিক্ষা দান করিবেন।" এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার একটি বিষয় এই যে, আরবী ভাষায় সুবিজ্ঞ সেকালের আরববাসীগণের নিকট আরবী ভাষায় কোরআনের আয়াত (يتلو عليهم) পাঠ করিয়া শুনাইবার পর (ويعلمهم الكتاب) ঐ কোরআনের শিক্ষাদান করার তাৎপর্য্য কি? আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় ব্যক্তিদের সম্মুখে পবিত্র কোরআনের যে শিক্ষা ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল কেয়ামত পর্যন্ত আমাদের ন্যায় মোসলমগণের জন্য সেই শিক্ষা ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন কোন্ বস্তুর দ্বারা মিটিয়া যাইবে।

আলোচ্য আয়াতে আরও একটি তথ্যমূলক বিষয় রহিয়াছে—উহা এই যে, এখানে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কার্যক্রমরূপে চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন—(১) আল্লার কিতাব—পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ জগদ্বাসীকে পাঠ করিয়া শুনান। (২) মানব জাতিকে পবিত্র করা। (৩) তাহাদিগকে আল্লার কিতাব—পবিত্র কোরআনের শিক্ষা দান করা। (৪) এবং হেকমত শিক্ষা দান করা। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই চারিটি কার্যক্রম কোরআন শরীফের বহু আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ইহা অতিসুস্পষ্ট যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) মানব জাতির জন্য আল্লার পক্ষ হইতে আল্লার কিতাব—পবিত্র কোরআন ভিন্ন আরও একটি জিনিস বিতরণ ও শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন যাহাকে 'হেকমত' বলা হইয়াছে।

অতঃপর বিশ্বভাণ্ডারে তল্লাশী চালাইলে দেখা যাইবে যে, মানব জাতি রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে আল্লার কিতাব ভিন্ন আরও যাহা লাভ করিয়াছে তাহা হইল একমাত্র সুন্নাহ, যাহাকে হাদীছ বলা হইয়া থাকে। প্রায় ১৩০০ বৎসর পূর্বে সঙ্কলিত এবং আজ পর্যন্ত বিশ্ব মোসলেম কর্তৃক গৃহীত ও সমর্থিত ইমাম মালেক মদনীর 'মোয়াত্তা' নামক কিতাবে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি বাণী এইরূপে লিপিবদ্ধ আছে যে—

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়া গিয়াছেন, "আমি তোমাদের নিকট দুইটি মহান বস্তু রাখিয়া যাইতেছি, সেই বস্তুদ্বয়কে যাবৎ তোমরা আঁকড়াইয়া থাকিবে তাবৎ কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না:—(১) আল্লার কিতাব ও (২) আল্লার রসুলের সুন্নত।"

হাদীছের অপরিহার্য্যতা বর্ণনার পর এখন আমরা দেখাইতে চাই যে, ঐ অপরিহার্য্য জ্ঞান-ভাণ্ডার—হাদীছে-রসুল (দঃ) সর্ববাদী সম্মত প্রমাণের বিধানেই নির্ভরশীলরূপে বিদ্যমান আছে।

হাদীছ প্রমাণিত হওয়ার যুক্তি-যুক্ত সূত্র : দুনিয়াতে কোন ঘটনা ঘটিয়া যাওয়ার পর বা কোন কথা ব্যক্ত হওয়ার পর পরবর্তী কালে প্রয়োজন ক্ষেত্রে ঐ ঘটনা বা কথা প্রমাণিত হইবার জন্য আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও যুক্তি-জ্ঞান অনুসারে কি কি সূত্র আছে যদ্দ্বারা উহা তর্কাতীত, নির্ভরশীল ও বিশ্বাসযোগ্যরূপে প্রমাণিত হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বের যুক্তিবাদী, জ্ঞানী ও আইনজ্ঞগণ এক বাক্যে ইহাই বলিবেন যে, ঐরূপ ঘটনা বা কথার প্রমাণের জন্য একমাত্র সূত্র হইল সাক্ষ্য; এবং সাক্ষ্য দুই প্রকারের হইতে পারে। এক প্রকার প্রত্যক্ষদর্শী বা প্রত্যক্ষ শ্রোতার মৌখিক সাক্ষ্য, দ্বিতীয় প্রকার তাহাদের লিখিত সাক্ষ্য। ইহাতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নাই যে, উভয় প্রকারের সাক্ষ্যই সর্বক্ষেত্রে অবলম্বিত ও গৃহীত হইয়া থাকে। মৌখিক সাক্ষ্য লিখিত সাক্ষ্য হইতে কোন দিক দিয়াই কম নহে, বরং আইন-আদালতে মৌখিক সাক্ষ্যই অগ্রগণ্য। কোন সাক্ষী স্বীয় সাক্ষ্য লিখিয়া আদালতে পত্রাকারে পাঠাইলে মৌখিক সাক্ষ্যের ন্যায় উহা সরাসরি গ্রহণীয় হয় না। অধিকন্তু লিখিত সাক্ষ্যও মৌখিক সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল, কারণ লেখকের মৃত্যুর পর উহা লেখকের স্বলিখিত হওয়া প্রমাণিত হওয়ার জন্য মৌখিক সাক্ষ্যই একমাত্র পথ।

বিশ্বের বিরাট জ্ঞান-ভাণ্ডার ইতিহাস-শাস্ত্র, মৌখিক সাক্ষ্যের উপরই রচিত হইয়াছে। মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হইলে বিশ্বের সব কিছুই অচল হইয়া পড়িবে। এমনকি বংশ পরিচয়—মাতা-পিতার পরিচয় ইত্যাদি মৌখিক সাক্ষ্যের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। মৌখিক সাক্ষ্যের দ্বারা মানুষের জীবন মরণ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পর্য্যন্ত প্রমাণিত হইয়া থাকে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবিত কালেও তাঁহার হাদীছসমূহ মৌখিক সাক্ষ্যের দ্বারা গ্রহণ করা হইত। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাজার হাজার ছাহাবী ছিলেন, তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে বসবাস করিতেন এবং নানা দেশ-বিদেশে যাতায়াত করিতেন। সুতরাং তাঁহার প্রত্যেকটি হাদীছকে প্রত্যেকটি লোকের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করার সুযোগ হওয়া সম্ভব ছিল কি? তিনি বিভিন্ন দেশে স্বীয় মোবাল্লেগ (প্রচারক) পাঠাইতেন, প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতেন; তাঁহারা তাঁহার বাণী-সমূহ প্রচার করিয়া থাকিতেন এবং ঐরূপে সেই সকল মৌখিক সাক্ষ্যের উপরই সমস্ত জগতে ইসলাম প্রসার লাভ করিয়াছিল; সুতরাং মৌখিক সাক্ষ্যের নির্ভরশীলতা অতি সুস্পষ্ট। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাজার হাজার বাণীর মধ্যে বড় ছোট প্রত্যেকটি বাণীই রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের পর্য্যন্ত পরম্পর ঐ মৌখিক সাক্ষ্যসমূহের দ্বারা প্রমাণিত আছে।

হাদীছের সনদ কি? হাদীছ প্রমাণিত করিতে সূত্র পরম্পরা মৌখিক সাক্ষ্যসমূহের তালিকাকেই ইসলামী পরিভাষায় "সনদ" বলা হয় এবং প্রত্যেক সাক্ষীকে "রাবী" বলা হয়। রাবী শুধু সাক্ষ্য দিয়াই চলিয়া যান নাই বরং রীতিমত শিক্ষা দান করিয়াছেন এবং শ্রোতাগণ শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাই সাক্ষ্যদাতা ওস্তাদ এবং শ্রোতা শাগেদ পরিগণিত হইয়াছেন। যে কোন মহামনীষী কর্তৃক

হাদীছ বলিয়া বর্ণিত কোনও বাক্যকে সনদ ব্যতিরেকে রসুলুল্লার (দঃ) হাদীছ বলিয়া ইসলাম কস্মিন-কালেও অনুমোদন করে নাই। একটি শব্দ সম্বন্ধেও হাদীছ বলিয়া দাবী করিলে সেখানে সনদ বা সাক্ষ্যের বিবরণ দিতে হইবেই। তাই ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রতিটি হাদীছই সর্ববাদী সম্মত নীতি ও যুক্তি অনুযায়ী তথা সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত আছে।

হাদীছের সনদ তথা সাক্ষ্যের নির্ভরশীলতা ও পরিপক্কতা :

যে কোন সাক্ষ্যের মধ্যেই মিথ্যা প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা থাকা একটি স্বাভাবিক বিষয়। মৌখিক সাক্ষ্যের তুলনায় লিখিত সাক্ষ্যের মধ্যে এই সম্ভাবনার অবকাশ কোনও অংশে কম নহে। মৌখিক কাহারও প্রতি মিথ্যারূপে কোন বিষয়ের বা কথার সম্পর্ক আরোপ করা অপেক্ষা লিখিত ভাবে উহা করা কোনও কঠিন ব্যাপার নহে। তদুপরি অনিচ্ছাকৃত ভাবে লেখার মধ্যে ভুল হওয়া বা লিখিত বস্তু পর্য্যায়ক্রমে নকল হইয়া আসার মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়া যাওয়া নিতান্তই সহজ স্বাভাবিক। যাহা হউক লিখিত বা মৌখিক উভয় প্রকার সাক্ষ্যের মধ্যেই অসত্যের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও দুনিয়াতে সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া গত্যন্তর নাই, অন্যথায় সারা জগৎ অচল হইয়া পড়িবে। অবশ্য মিথ্যা সাক্ষ্য এড়াইবার জন্য সর্বক্ষেত্রেই সাক্ষ্যদাতার প্রতি নানা বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়।

সনদের সত্যতা : হাদীছের সাক্ষ্য অর্থাৎ "সনদ" গ্রহণীয় হওয়ার জন্য মোহাদ্দেছ—হাদীছ-বিশারদগণ বহুমুখী শর্ত-শরায়েত ও অতি কড়াকড়ি আরোপ করিয়া যে সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করিয়াছেন উহা অন্যত্র একেবারেই বিরল। এমনকি বিশ্বে উহার নজীর কেহই কোথাও দেখাইতে পারিবে না। ঐ সমস্ত কড়াকড়ি দৃষ্টে বিশ্ববাসীকে এরূপ চ্যালেঞ্জ প্রদান করা যাইতে পারে যে, হাদীছের প্রামাণিকতার মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ নাই।

ঐ সমস্ত নিয়ম-কানুন লিপিবদ্ধ করিয়া "উসুলে-হাদীছ" বা হাদীছের প্রামাণিকতা পরীক্ষা করার নিয়ম-কানুন নামে একটি বিশেষ শাস্ত্র সঙ্কলন করা হইয়াছে এবং এই শাস্ত্রে বহু কিতাব লেখা আছে। নিম্নে ঐ সকল নিয়ম-কানুনের কতিপয় ধারা ও উপধারা উদ্ধৃত হইল :—

হাদীছরূপে গ্রহণীয় হইবার জন্য সাধারণতঃ উহার সনদে চারিটি প্রধান বিষয়ের প্রতি সর্ব-প্রথমে নজর দিতে হইবে। যথা—(১) শত শত বা হাজার হাজার বৎসর পরেই হউক না কেন, নবী (দঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সূত্র-পরম্পরায় পর্য্যায়ক্রমে যতজন সাক্ষীর মাধ্যমে হাদীছখানা পৌঁছিয়াছে, এক এক করিয়া সমস্ত সাক্ষীর পরিচিত নামের তালিকা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিতে হইবে, কোন একজনের নামও বাদ না পড়ে, নতুবা হাদীছ গ্রহণীয় হইবে না। ❁ এই ধারাটির সহিত আবার দুইটি উপধারাও রাখা হইয়াছে।

❁ মোহাদ্দেছগণ প্রত্যেক হাদীছের সঙ্গে উহার সনদ বা সাক্ষীগণের তালিকা উল্লেখ করেন, যথা—ইমাম বোখারী (রঃ) বলেন, মোহাদ্দেছ হোমায়দী আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি সুফিয়ান নামক মোহাদ্দেছের মুখে শুনিয়াছেন, তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সায়ীদ আনছারীর মুখে শুনিয়াছেন, তিনি মোহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম তায়মীর নিকট হইতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন যে, তিনি আল্‌কামা ইবনে আবী ওকাছের মুখে নিজ কানে শুনিয়াছেন, তিনি ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে মিম্বরে দাঁড়াইয়া ঘোষণা দিতে শুনিয়াছেন যে, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি……انما الاعمال بالنيات । (পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

(ক) উক্ত সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে প্রতিটি সাক্ষী বা রাবী তাঁহার পূর্বের সাক্ষ্যদাতার নাম উল্লেখ করার সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিবেন যে, আমি "অমুকের মুখে শুনিয়াছি, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন" বা "অমুকে আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন।" কোন একজন সাক্ষীও যদি ঐরূপ স্পষ্ট শব্দ না বলিয়া কোন অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেন, যেমন এরূপ বলেন যে—"সলীম কলীম হইতে বর্ণনা করিয়াছে" একটি সাক্ষীর বেলায়ও এইরূপ অস্পষ্ট ভাষা ব্যবহৃত হইলে ঐ সনদ গ্রহণীয় হওয়ার জন্য বহু রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে। ইমাম বোখারী (র:) এরূপ সনদ গ্রহণ ব্যাপারে সর্বাধিক কড়াকড়ি আরোপ করিয়াছেন।

লক্ষ্য করুন! কতদূর সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে; যে—"সলীম কলীম হইতে বর্ণনা করিয়াছে" এরূপ বলিলে স্পষ্ট বুঝা যায় না যে, সলীম সরাসরি কলীমের মুখে শুনিয়াছে। বরং এরূপও হইতে পারে যে, অন্য কোনও ব্যক্তির মাধ্যমে শুনিয়াছে, অথচ ঐ ব্যক্তির নাম এখানে উল্লেখ নাই, ইহাতে ১ নম্বর ধারা লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এইরূপ সামান্য সন্দেহের অবকাশও যেন না থাকিতে পারে, তজ্জন্য এই উপধারা রাখা হইয়াছে। এমনকি, যদি কোন রাবীর বিষয় এরূপ প্রমাণিত হয় যে, সে এরূপ অস্পষ্ট ভাষার আড়ালে প্রকৃত প্রস্তাবেই ১ নম্বর শর্ত লঙ্ঘন করিয়া হাদীছ বর্ণনা করিয়াছে তবে হাদীছের পরিভাষায় তাহাকে "মোদাল্লেস" বলা হইবে। এরূপ ব্যক্তি সর্বস্থানে সন্দেহজনক বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(খ) প্রত্যেক সাক্ষী ও তাঁহার পূর্ববর্তী উপরের সাক্ষী উভয়ের জীবনকাল ও বাসস্থান এরূপ পর্য্যায়ের হইতে হইবে যেন উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা অসম্ভব না হয়।

(২) সাক্ষ্যদাতাদের প্রত্যেক ব্যক্তি হাদীছ বিশারদগণের নিকট নাম ঠিকানা, গুণাবলী, স্বভাব-চরিত্র এবং কোন্ কোন্ ওস্তাদের নিকটে হাদীছ শিক্ষা করিয়াছেন ইত্যাদি সর্ববিষয়ে পরিচিত হইতে হইবে। সাক্ষ্যদাতাদের একজনও অপরিচিত হইলে ঐ হাদীছ গ্রহণীয় নহে।

(৩) আগাগোড়া প্রতিটি সাক্ষীই জ্ঞানী, খাঁটী সত্যবাদী, † সচ্চরিত্র, মোত্তাকী, পরহেজগার, শালীনতা ও ভদ্রতাসম্পন্ন, সৎ-স্বভাবের হইতে হইবে। কোন ব্যক্তি জীবনে মাত্র একবার হাদীছ সংক্রান্ত ব্যাপারে মিথ্যা উক্তির জন্য ধরা পড়িলে ঐ ব্যক্তির শুধু ঐ মিথ্যা হাদীছই নহে, বরং তাহার সারা জীবনের সমস্ত হাদীছই অগ্রাহ্য হইবে। তওবা করিলেও তাহার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য হইবে না। তাছাড়া অন্য কোন বিষয়েও মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হইলে বা শরীয়ত বিরোধী আকিদা বা কার্য্যকলাপে লিপ্ত প্রমাণিত হইলে বা অসৎ প্রকৃতির লম্পট ও নীচ-স্বভাবের লোক হইলে তাহার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণীয় হইবে না।

লক্ষ্য করুন। একটি বিষয়কে হাদীছরূপে প্রমাণ করিতে বোখারী (র:) স্বীয় ওস্তাদ হইতে রসূলুল্লাহ (দ:) পর্য্যন্ত সাক্ষ্যদাতাদের পূর্ণ তালিকা বর্ণনা করিলেন। এইরূপেই মোহাদ্দেছগণ সনদযুক্ত বর্ণনা করেন। বোখারী শরীফের প্রত্যেকটি হাদীছ সনদসহ বর্ণিত আছে। সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে অনুবাদে সনদ উল্লেখ করা হয় নাই।

† মোহাদ্দেছ—হাদীছ বর্ণনাকারী ও হাদীছ শিক্ষাদানকারী বা হাদীছের সাক্ষীগণের সত্যবাদীতার পরীক্ষা কঠোরভাবে করা হইত। উচ্চ মর্য্যাদা সম্পন্ন কতিপয় আলেম পরীক্ষার সম্মুখীন ব্যক্তির স্ব-গ্রাম ও স্ব-গোত্রে যাইয়া তাহার সত্যবাদিতা যাচাই করিতেন। এই ব্যক্তি জীবনে কখনও

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

(৪) প্রত্যেকটি সাক্ষী তাহার স্মরণশক্তি সম্পর্কে অতিশয় পাকাপোক্ত, সুদক্ষ ও সুদৃঢ় সংরক্ষক বলিয়া পরিচিত হইতে হইবে× এবং ইহাও সুপ্রমাণিত হওয়া আবশ্যক যে, প্রতিটি সাক্ষী তাহার পূর্ববর্তী সাক্ষ্যদাতা অর্থাৎ ওস্তাদের নিকট হইতে হাদীছখানা পূর্ণ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করতঃ সবিশেষ মনোযোগের সহিত মুখস্ত করিয়া বা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই বিষয়ের প্রমাণ এইরূপে

মিথ্যা বলে নাই প্রমাণিত হইলে তাঁহাকে সত্যবাদী সাব্যস্ত করতঃ মোহাদ্দেছ বা হাদীছ বর্ণনাকারী ও শিক্ষাদানকারীরূপে গ্রহণ করা হইত ; নতুবা নহে।

এরূপ পরীক্ষার একটি নজীর চতুর্থ শতাব্দীর বিখ্যাত মোহাদ্দেছ আবু হাতেম—মোহাম্মদ ইবনে হাব্বান روضة العقلاء কিতাবের ৪০ পৃষ্ঠায় সনদযুক্ত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

রিবয়ী ইবনে হেরাশ (রঃ) যিনি প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ—যখন তাঁহার পরীক্ষা হইল এবং তাঁহার বস্তি ও গোত্রের লোকগণ এক বাক্যে তাঁহার সততার সাক্ষ্য দিল তখন একজন শত্রু তাঁহার মোহাদ্দেছ গণ্য হওয়ার মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করিল। সে তৎকালীন শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে বলিল, রিবয়ী ইবনে হেরাশ আজ মোহাদ্দেছ শ্রেণীভুক্ত হইবেন ; তাঁহার বস্তি ও গোত্রের সকলে তাঁহার সত্যবাদীতার সাক্ষ্য দিয়াছে। আপনি একটু লক্ষ্য করিলেই তিনি একটু মিথ্যায় জড়িত হইয়া পড়িবেন। তাঁহার দুইটি ছেলেকে আপনি সামরিক বাহিনীতে যোগদানের আদেশ করিয়াছেন, তাহারা নিজ গৃহেই পলাতক আছে। তাহাদের পিতা রিবয়ী ইবনে হেরাশ তাহা অবগত আছেন। আপনি তাঁহাকে ছেলেদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে তিনি নিশ্চয়ই মিথ্যা বলিবেন। সে ভাবিয়াছিল, হাজ্জাজ অতি ভয়ঙ্কর শাসনকর্তা, তাই রিবয়ী ইবনে হেরাশ নিশ্চয় সন্তানদ্বয়ের প্রাণ রক্ষার্থে বলিবেন, আমি ছেলেদ্বয়ের খবর জ্ঞাত নহি। এইভাবে তিনি মিথ্যায় জড়িত হইয়া পড়িবেন।

সেমতে শাসনকর্তা হাজ্জাজ তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি রিবয়ী? তিনি বলিলেন, হাঁ। আপনার ছেলেদ্বয়ের খবর জানেন কি? তিনি ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন, তাহারা গৃহের মধ্যেই পলাতক রহিয়াছে। এইভাবে তিনি সত্যবাদীতার দ্বারা হাজ্জাজের ন্যায় পাষাণ আত্মাকেও জয় করিয়া ফেলিলেন। হাজ্জাজ তাঁহার পরিপক্ক সত্যবাদীতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সততা ও সুনামের ঘোষণা করিয়া দিলেন।

× পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, কোন মোহাদ্দেছ হাদীছের শিক্ষা ও সাক্ষ্যদাতা গণ্য হইবার জন্য তাঁহার সত্যবাদিতা পরীক্ষিত হইত। তদ্রূপ তাঁহার স্মরণশক্তিও পরীক্ষা করা হইত। স্বয়ং বোখারী (রঃ)কে এরূপ পরীক্ষা করার ঘটনা বর্ণিত আছে। বোখারী (রঃ) প্রথম জীবনে বাগদাদে উপস্থিত হইলে স্থানীয় হাদীছবিশারদগণ তাঁহার পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহারা একশতটি হাদীছ তৈয়ার করিলেন ; ঐ হাদীছ সমূহের মূল হাদীছ ও সনদের মধ্যে গড়মিল এবং আরও নানা-প্রকার উলট-পালট করিয়া সাজাইলেন। অতঃপর দশ জন আলেম নির্দিষ্ট করা হইল যাঁহারা ঐ ভুল হাদীছ সমূহের দশটি করিয়া পর পর ইমাম বোখারীর সম্মুখে পেশ করিবেন এবং তাঁহার মন্তব্য জিজ্ঞাসা করিবেন। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে তাহা করা হইল। প্রত্যেকটি হাদীছের সঙ্গে তিনি শুধু এতটুকু বলিয়া যাইতে লাগিলেন যে, এরূপ কোন হাদীছ আছে বলিয়া আমি মনে করি না। একশত গড়মিল হাদীছ পেশ করা শেষ হইলে পর তিনি ঐগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত মন্তব্য আরম্ভ করিলেন যে, অমুক ব্যক্তি প্রথমে এই হাদীছটি পেশ করিয়াছেন, উহাতে এই এই ভুল আছে, উহার প্রকৃত রূপ এই।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

হইবে যে, উক্ত সাক্ষী যে যে হাদীছ আজীবন শত শত বার বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন কোন সময়ই তাঁহার বর্ণনার মধ্যে অসামঞ্জস্য বা কোনরূপ গড়মিল পরিলক্ষিত হয় নাই।+ যখন যে সাক্ষীর বর্ণনা মধ্যে এইরূপ গড়মিল দেখা যাইবে তখন হইতে আর ঐ সাক্ষীর বর্ণনার কোন হাদীছ সঠিক প্রমাণিত বলিয়া গণ্য হইবে না। এই ধারা অনুসারেই বহু বড় বড় গণ্যমান্য হাদীছ বর্ণনাকারী ব্যক্তিগণও বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইবার পর তাঁহাদের ঐ অবস্থায় বর্ণিত হাদীছ পূর্ণ নির্ভরযোগ্য পরিগণিত হয় নাই। তাছাড়া যাহাদের সাধারণ কথাবার্তায় বেশী ভুল দেখা গিয়াছে তাহাদের হাদীছও গ্রহণীয় হয় নাই।

হাদীছ পরীক্ষার এই চারিটি প্রধান শর্ত। আরও বহু খুটিনাটি বিষয়াদি আছে যাহা সুধিজ্ঞ আলেমগণ অবগত আছেন। যাহার দ্বারা হাদীছের প্রামাণিকতা আরও অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া যায়।

এইভাবে একশত হাদীছের বিষয়ে মন্তব্য করিলেন; ঐ ভুল হাদীছগুলি তাঁহার সম্মুখে যে ধারাবাহিকতায় পেশ করা হইয়াছিল উহাতেও কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না।

কী স্মরণশক্তি! একশত ভুল হাদীছ একবার মাত্র শুনিয়া অবিকলরূপে এবং তরতীব সহ কণ্ঠস্থ করিয়া লইতে সক্ষম হইলেন; পরীক্ষকগণের নিকট এই বিষয়টি অতি বিস্ময়কর ছিল।

+ ইমাম বোখারী (রঃ) সঙ্কলিত "কিতাবুল-কুনা" ৩৩ পৃষ্ঠায় একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তৎকালীন শাসনকর্তা মারওয়ান আবু হোরায়রা (রাঃ) ছাহাবীর হাদীছ কণ্ঠস্থ রাখার ক্ষমতা পরীক্ষার গোপন উদ্দেশ্যে নানারূপ ছলে-বলে তাঁহার দ্বারা হাদীছ বর্ণনা করাইলেন এবং মারওয়ানের সেক্রেটারী পর্দার আড়ালে থাকিয়া গোপনে ঐ সব হাদীছ অক্ষরে অক্ষরে লিখিয়া রাখিলেন। এক বৎসর পর মারওয়ান আবু হোরায়রা (রাঃ)কে পুনরায় দাওয়াত করিয়া আনিলেন এবং সেক্রেটারীকে পূর্বে লিখিত লিপি সহ আড়ালে বসাইলেন। অতঃপর আবু হোরায়রা (রাঃ)কে এক বৎসর পূর্বে বর্ণিত হাদীছসমূহ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনি এক একটি করিয়া বর্ণনা করিলেন। সেই সেক্রেটারীর সাক্ষ্য যে, দীর্ঘ এক বৎসর ব্যবধান সত্ত্বেও এত বেশী সংখ্যক হাদীছের বর্ণনার মধ্যে একটি অক্ষরেরও ব্যতিক্রম ছিল না।

দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ—ইবনে শেহাব যুহরী (রঃ) তৎকালীন রাষ্ট্রীয় প্রেসিডেন্ট হেশাম কর্তৃক এইরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন; ইমাম জাহাবীর সঙ্কলিত "তাজকেরা" কেতাবের প্রথম খণ্ড ২০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, একদা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট মোহাদ্দেছ যুহরীকে অনুরোধ করিলেন যে, আপনি আমার ছেলের জন্য কতকগুলি হাদীছ লিখাইয়া দিন। তিনি একজন সরকারী কেরাণীকে ডাকিয়া চারি শত হাদীছ লিখাইয়া দিলেন। প্রেসিডেন্ট মোহাদ্দেছ যুহরীকে এক মাস কাল পরে ডাকিয়া পূর্বে লিখিত লিপিখানা হারাইয়া যাওয়ার ভান করিয়া ঐ চারি শত হাদীছ পুনরায় লিখাইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি তাহাই করিলেন, বস্তুতঃ পূর্বের লিপি হারাইয়া ছিল না। চারি শত হাদীছের নূতন পুরাতন লিপিদ্বয়ে এক অক্ষরেরও পার্থক্য হইল না।

• মোহাদ্দেছগণ স্মরণশক্তির প্রতি কত সতর্ক থাকিতেন সে সম্পর্কে ইমাম তিরমিযির (রঃ) একটি ঘটনা আছে। তিরমিজি (রঃ) শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ছিলেন, তবুও হাদীছ শিক্ষা দিতেন, এমনকি ভ্রমণাবস্থায়ও তাঁহার সঙ্গে হাদীছ পিপাসুগণ থাকিতেন। একদা উষ্ট্রে আরোহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন; পথিমধ্যে একস্থানে তিনি অল্প সময়ের জন্য মাথা নত করিয়া রাখিলেন। সঙ্গীগণ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ঐ স্থানে মাথা নত করিলেন কেন? তিনি বলিলেন, ঐ স্থানে কি একটি বৃক্ষ রাস্তার উপর ঝুকিয়া পড়ে নাই যে, উষ্ট্রারোহীদের মাথা উহাতে আঘাত পাইবে? সকলেই

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

এইরূপ শর্তসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হাদীছ বিশারদগণের মধ্য হইতেই যুগে যুগে এক শ্রেণীর মনীষীবৃন্দ এক বিরাট ইতিহাসের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যাহার মূল্য বর্তমান যুগের আপন-ভোলা মোসলেম সমাজ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও বিজাতীয়গণ, এমনকি অধুনা জ্ঞান-বিজ্ঞানের একচেটিয়া দাবীদার—ইউরোপবাসীরাও নতশিরে মানিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছে যে, এই অমূল্য রত্ন—মহান ইতিহাস-ভাণ্ডার একমাত্র মোসলমানদেরই অমরকীর্তি। ইহার নজীর অন্য কোন জাতি কোন কালে দেখাইতে সক্ষম হয় নাই এবং হইবেও না। সেই অমূল্য রত্নটি হইল এক বিশেষ শাস্ত্র যাহাকে ইসলামী পরিভাষায় (اسماء الرجال) "আছমাউর-রেজাল" অর্থাৎ হাদীছের সাক্ষ্যদাতা ও রাবীগণের জীবনেতিহাস বা জীবন-চরিত বলা হইয়া থাকে। তাহাতে উল্লিখিত চারিটি ধারা এবং উহা ছাড়াও হাদীছের সাক্ষ্যদাতাদের বিষয়-সংক্রান্ত খুটিনাটি বিষয়াদি রহিয়াছে, সে সব দৃষ্টে ঐ শাস্ত্রের মধ্যে প্রতিটি রাবী তথা হাদীছের সাক্ষ্যদাতার জন্ম-মৃত্যুর তারিখ, পরিচিত ও অপরিচিত নাম, বংশ-পরিচয় বাসস্থান, শিক্ষাকেন্দ্র, তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্তী হাদীছ-বিশারদগণ কর্তৃক তাঁহার প্রতি মন্তব্য সমূহ এবং তাঁহার সংগুণাবলী বা দোষ-ত্রুটির বিস্তারিত বিবরণ এবং তিনি যে সমস্ত লোকের নিকট হইতে হাদীছ শিক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে যাঁহারা শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের ফিরিস্তি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই শাস্ত্রের শুধু প্রসিদ্ধ ও সচরাচর প্রচলিত কিতাব সমূহের মধ্যে উল্লিখিত আকারে ৮৫০০০ হাজার রাবী বা সাক্ষ্যদাতার জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধকারে বিশ্ব-ভাণ্ডারে মওজুদ রহিয়াছে। বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হজর আসকালানী (রঃ) কর্তৃক চার খণ্ডে সঙ্কলিত "আল-এসাবাহ্" নামক কিতাবে ১৯৩৩৯ জন লোকের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁহারই একাদশ খণ্ডে সঙ্কলিত "তাহ্জীবুত-তাহ্জীব" কিতাবে ১২৪৫৫ সংখ্যক লোকের বিস্তারিত জীবনী বর্ণিত আছে। তাঁহার পূর্বে হাফেজ ইয়াহ্ইয়া ইবনে মায়ীন ও হাফেজ শামছুদ্দীন জাহাবীর ন্যায় বড় বড় মনীষী এই বিষয়ে বহু কিতাব সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন।

এই শাস্ত্রে সর্বমোট ৫০০০০০ পাঁচ লক্ষ রাবী বা হাদীছ বর্ণনাকারী সাক্ষীদের বিস্তারিত জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। (তদরীবে হাদীছ)

প্রসিদ্ধ জার্মানী ডঃ স্প্রেঙ্গার যিনি ১৮৫৪ ইং সনে বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন এবং আরবী সহ বিভিন্ন ভাষার অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন—তিনি লিখিয়াছেন, "দুনিয়ার বুকে এমন কোন জাতি অতীতেও হয় নাই, বর্তমানেও নাই যে জাতি মোসলমানদের ন্যায় "আছমাউর-রেজাল" শাস্ত্রের আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছে। সেই শাস্ত্রের সাহায্যে পাঁচ লক্ষ মানুষের জীবনেতিহাস জ্ঞাত হওয়া যায়।" (উপরোল্লিখিত আল-এসাবাহ নামক কিতাবের ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি এই কথা লিখিয়াছেন।)

বলিল, ঐ স্থানে কোন বৃক্ষই নাই। তিনি বলিলেন, বহু দিন পূর্বে চক্ষু ভাল থাকাকালীন আমি এই পথে ভ্রমণ করিয়াছিলাম, সেই সময় এই পথে একটি বৃক্ষ ছিল, আমি ঐ স্থানটিকে সেই বৃক্ষতল মনে করিয়া মাথা নত করিয়াছি। তোমরা ঐ স্থান-সংলগ্ন বস্তির লোকদের নিকট সঠিক তথ্য অবগত হও। ঐ স্থানে কোন সময় ঐরূপ বৃক্ষ ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া না গেলে আমি হাদীছ বর্ণনা করা বন্ধ করিয়া দিব; মনে করিব, আমার স্মরণশক্তি দুর্বল হইয়া গিয়াছে।

সত্য সত্যই ঐ বস্তির বয়োবৃদ্ধদের নিকট জানা গেল, পূর্বকালে ঠিক এই স্থানে ঐরূপ বৃক্ষ ছিল। তখন তিনি স্বীয় স্মরণশক্তি বহাল থাকায় আল্লার শোকর আদায় করিলেন।

বোখারী শরীফ ও মোসলেম শরীফের বিশেষত্ব :

পূর্বেই বলা হইয়াছে—যে চারিটি ধারার বিষয় আলোচনা হইল, ঐ কয়টি হইল সাধারণ ধারা। অর্থাৎ কোন হাদীছকে সাধারণভাবে নির্ভরযোগ্য বলিতে হইলে ঐ সব ধারা উহার সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে অবশ্যই পাওয়া যাইতে হইবে। কিন্তু বিশিষ্ট বিশিষ্ট হাদীছ-বিশারদগণ তাঁহাদের কোন কোন গ্রন্থের জন্য উক্ত চারিটি ধারা সম্বলিত সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যেও অন্যান্য গুণাবলী দৃষ্টে আরও শ্রেণী বিভক্ত করিয়াছেন। তদুপরি আরও বহু বিশিষ্ট গুণাবলীর শর্ত আরোপ করিয়াছেন। আটা বা ময়দা সাধারণতঃ প্রথমে মোটা চালুনী দ্বারা চালা হয়, তারপর উহা সূক্ষ্ম চালুনীতে চালা হয়; কেহ কেহ আবার উহাকে কাপড়ে ছাকিয়া ব্যবহার করেন। এমতাবস্থায় ঐ আটা বা ময়দার মধ্যে যেমন কোন প্রকার আবর্জনা থাকিতে পারে না; তেমনি হাদীছের প্রামাণিকতার ক্ষেত্রে যাহাতে কোনরূপ সন্দেহ বা ভেজাল থাকিতে না পারে তজ্জন্য হাদীছের রাবী বা সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যেও ঐরূপ শ্রেণী বিভাগ করা হইয়া থাকে এবং এই শ্রেণী বিভক্তির দিক দিয়া যিনি যেই গ্রন্থের জন্য যত বেশী সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিচার বিশ্লেষণে অতিশয় কড়াকড়ি আরোপ করিয়াছেন, তিনি এবং তাঁহার সেই গ্রন্থ তত পরিপক্ক ও বিশ্বস্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই দিক দিয়া সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী হইয়াছেন, ইমাম বোখারী (রঃ) ও তাঁহার শাগের্দ ইমাম মোসলেম (রঃ)। এবং উক্ত মহামনীষীদ্বয় কর্তৃক সঙ্কলিত দুইখানা গ্রন্থ—"বোখারী শরীফ ও মোসলেম শরীফ" দুনিয়ার বুকে আজ বার শত বৎসরেরও অধিক কাল হইতে এই শ্রেণীর সমুদয় গ্রন্থের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহারা সর্বমোট ৫০০০০ রাবী বা বর্ণনাকারী—হাদীছের সাক্ষীদের মধ্যে সচরাচর পরিচিত ৮৫০০০ রাবী বা সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে শ্রেণী বিভক্ত করিয়া ২৪০৪ জন রাবীকে সূক্ষ্মদর্শীতার কষ্টি পাথরে যাচাই করিয়া দুগ্ধ হইতে মাখন বাহির করার ন্যায় বাছিয়া লইয়াছেন।

বোখারী শরীফের বিশেষত্ব :

ইমাম বোখারী (রঃ) ও ইমাম মোসলেম (রঃ) এই দুইজন ওস্তাদ শাগের্দের মধ্যে সাধারণ নিয়মকেই আল্লাহ তায়ালা বজায় রাখিয়াছেন। ওস্তাদ ইমাম বোখারী (রঃ) ও তাঁহার গ্রন্থখানাই বিশ্বের বুকে অগ্রগণ্য হইয়াছে। তিনি আরও সূক্ষ্মতমভাবে যাচাই করিয়া বোখারী শরীফ গ্রন্থের জন্য ২৪০৪ জন হইতে ৬২০ জনকে বাদ দিয়াছেন। তাই তাঁহার এই গ্রন্থখানা সর্বাধিক উচ্চতর শীর্ষস্থানের অধিকারী হইয়াছে। সমগ্র বিশ্বে প্রবাদরূপে স্বীকৃত রহিয়াছে—

اصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخارى

অর্থাৎ আল্লার কিতাব—কোরআন শরীফের পরেই বিশ্বস্ততার সর্বপ্রথম স্থানের অধিকারী ইমাম বোখারীর এই অদ্বিতীয় গ্রন্থ বোখারী শরীফ। এবং এই জন্যই ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহে হাদীছ-শাস্ত্রের সম্রাট উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বোখারী (রঃ) পর্য্যন্ত যে সকল সাক্ষ্যদাতা বা রাবীর মাধ্যমে এই গ্রন্থের মধ্যে হাদীছ গ্রহণ করা হইয়াছে তাঁহাদের মোট সংখ্যা হইল প্রায় ১৮০০।* তন্মধ্যে ১৩৫৪ জন হইলেন এইরূপ যাঁহাদের মাধ্যমে ইমাম বোখারী ও ইমাম মোসলেম

* এই ১৮০০ শতের মধ্যে ১০১ জন হইলেন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী। ছাহাবীগণ বিশ্বস্ততায় প্রশ্নের উর্দ্ধে; তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য ও সত্যবাদিতা পূর্বাপর মোসলেম জাহানের সর্ববাদী সম্মত বিষয়। অবশিষ্ট ১৬৯০ সংখ্যার অধিকাংশই তাবেয়ীন বা তাবয়ে-তাবেয়ীন তথা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটতম সোনালী যুগের লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

উভয়েই হাদীছ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহারা সকলেই শীর্ষস্থানীয় পরিগণিত। অবশিষ্ট ৪৩০ হইতে কিছু অধিক সংখ্যক রাবীর নিকট হইতে শুধু বোখারী (রঃ) হাদীছ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ঐসব রাবী বা সাক্ষ্যদাতা ইমাম বোখারীর সুক্ষ্মতম বাছনীর মধ্যে গ্রহণীয়রূপে বিবেচিত হইয়াছিলেন। তদ্রূপ শুধু ইমাম মোসলেমও প্রায় ৬২০ সংখ্যক রাবী হইতে হাদীছ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁহাদেরকে সুক্ষ্মতম বাছনীতে তাঁহার বিশেষ গ্রন্থ বোখারী শরীফের ক্ষেত্রে বাদ দিয়াছেন।

মোট ২৪০৪ জন মানুষের জীবনেতিহাস কোনও অসাধ্য বা অপ্রকাশ্য বস্তু নহে, বরং পূর্বালোচিত "আছমাউর-রেজাল" শাস্ত্রের কিতাবসমূহে আলেখ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ হইয়া শত শত বৎসরকাল হইতে জগদ্বাসীর হাতে ও তাহাদের দৃষ্টিগোচরে বিদ্যমান রহিয়াছে; তদুপরি শুধু এই ২৪০৪ জন মানুষের পূর্ণ জীবনী সঙ্কলিত ও সুরক্ষিত আছে—যাহার জন্য قرة العينين فى رجال الصحيحين নামক একখানা কিতাবও পূর্বকাল হইতেই বিশ্বের বুকে প্রচলিত রহিয়াছে। উল্লিখিত বিষয়াবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিশ্ববাসীকে অনুরোধ করিতেছি, সুষ্ঠুরূপে প্রত্যেকটি রাবীর জীবনী অনুধাবন করতঃ তাঁহারাই বিচার করুন এই সমস্ত লোকদের দ্বারা কোনও মিথ্যা বর্ণনা প্রদান বা কোনরূপ মিথ্যানুষ্ঠান কতদুর সম্ভব।

রসুলুল্লার আদর্শ সকল দেশ ও পরিবেশ এবং সকল যুগ ও কালের জন্য

অধুনা কোন কোন বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের মুখেও এরূপ প্রশ্ন শোনা যায় যে, দীর্ঘ চৌদ্দশত বৎসরের পুরাতন আদর্শাবলী, বিশেষতঃ পর্বতমালা বেষ্টিত মরু অঞ্চল-অধিবাসী অনুন্নত যুগ ও অনুন্নত দেশের একটি লোক যে আদর্শ গড়িয়াছিলেন বর্তমান প্রগতিশীল ও উন্নতিশীল জগতে তাহা চলিবে কেন? বর্তমান জগত বহুদুর আগে বাড়িয়া গিয়াছে, এই অসাধারণ প্রগতির যুগে—এই বিজ্ঞানের যুগে পিছনের পুরাতন আদর্শ অচল হইতে বাধ্য। এত অগ্রগামী যুগের চাহিদা এত পশ্চাতের আদর্শ কিরূপে মিটাইতে পারে?

ইসলামী আদর্শের সুফল এবং অনৈসলামিক রীতিনীতির কুফল যাহা বাস্তব জগতেই প্রকাশ পাইয়া যাইতেছে উহা হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া নিয়া শুধু মাত্র মৌখিক বিতর্কের উপর উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে, হযরত মোহাম্মদ—রসুলুল্লাহ (দঃ) সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানের অভাবই হইল এই প্রশ্নের মূল। সুতরাং তাঁহার সম্পর্কে শুধু মাত্র দুইটি তথ্য পাঠক সমক্ষে তুলিয়া ধরিতেছি, অকপট চিত্তে উহার বাস্তবতা অনুধাবন করিতে পারিলে মূল প্রশ্নের অসারতা সঙ্গে সঙ্গেই ফুটিয়া উঠিবে।

প্রথম তথ্য—হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্থুল বিজ্ঞানের হিসাবে যতই অনুন্নত দেশের অনুন্নত যুগের এবং যতই পুরাতন কালের হউন না কেন, কিন্তু তিনি ছিলেন আদি-অন্ত সকল দেশ ও সকল পরিবেশের সৃষ্টিকর্তা আল্লার রসুল। এবং আল্লাহ বিশ্ব-জগতের সকল যুগ, দেশ ও পরিবেশের প্রতিটি বস্তুর অবস্থার পূর্ণ অভিজ্ঞতা রাখেন—ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير। "যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি কি সৃষ্টি সম্পর্কে সব কিছু জ্ঞাত থাকিবেন না? অধিকন্তু তিনি সমুদয় নিগূঢ় তত্ত্ব ও সুক্ষ্ম বিষয়ের এবং অপ্রকাশ্য সব কিছুর জ্ঞানের আকরও বটে।"

তিনি সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ, তাঁহার জ্ঞানের সম্মুখে নূতন-পুরাতন, অতীত-ভবিষ্যৎ বলিতে কিছু নাই, সব কিছুই সমান ভাবে তাঁহার জ্ঞান সমুদ্রের বিন্দু। সেই মহান স্রষ্টার সঙ্গে ছিল হযরত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দৃঢ় যোগসুত্র এবং তাঁহার প্রতিটি বাক্য ও চিন্তাধারার উৎস ছিলেন সেই মহান স্রষ্টা; এই ঘোষণাই পবিত্র কোরআন স্পষ্ট ভাষায় প্রদান করিয়াছে—

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى "মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) নিজের মনোবৃত্তি হইতে কিছুই বলেন না, তিনি যাহা কিছু বলেন সৃষ্টিকর্তার তরফ হইতে অহী প্রাপ্ত হইয়া সেই অহীর বিকাশ সাধন করেন মাত্র।" সুতরাং তাঁহার আদর্শ বস্তুতঃ তাঁহার রচিত বস্তু নহে, বরং বিশ্ব স্রষ্টা বিশ্বনিধি সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত বস্তু। উহার পাওয়ার ও শক্তিকে আমাদের নিজেদের রচিত আদর্শের পাওয়ার ও শক্তির মাপকাঠিতে পরিমাণ করা নিতান্তই ভুল হইবে; মণকে তোলার পাথরে পরিমাপ করা অপেক্ষা অধিক বোকামী হইবে।

দ্বিতীয় তথ্য :—বাক্য-বচনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জ্ঞান ও আদর্শ বিতরণ করা সম্পর্কে বিশ্বনবী ও সর্বশেষ পয়গাম্বর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা এমন একটি বিশেষ ক্ষমতা, শক্তি ও গুণ দান করিয়াছিলেন যাহা অন্য কোন মানুষ ত দূরের কথা পূর্ববর্তী কোন নবীকেও আল্লাহ তায়ালা উহা দান করিয়াছিলেন না।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সম্পর্কে এই বিষয়টির প্রতি বিশ্ববাসীকে সজাগ ও সচেতন রাখার উদ্দেশ্যে স্বয়ং হযরত (দঃ) বলিয়া গিয়াছেন—

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ.... وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ-

হাদীছখানা মোসলেম শরীফ ১৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সকল নবীগণের উপর ছয়টি বস্তুর দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। (মূল হাদীছের মধ্যে পূর্ণ ছয়টির উল্লেখই রহিয়াছে আমাদের আলোচ্য বিষয় শুধু তিনটি—) (১) আমাকে আল্লাহ তায়ালা "জাওয়ামেউল-কালেম" গুণ দান করিয়াছেন; (৫) আমি সারা বিশ্বমানবের রসুল-রূপে প্রেরিত হইয়াছি। (৬) নবীগণের আগমন আমার উপরই শেষ, আমার পরে কোন নবী আসিবেন না। (২১৮নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ছয়টি বস্তুর প্রথম বস্তুটি হইল আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়; অর্থাৎ "জাওয়ামেউল-কালেম।" "জাওয়ামে" শব্দটি বহুবচন, ইহার অর্থ "ব্যাপক পরিধিময় বস্তু।" "কালেম" শব্দটিও "কলেমা" শব্দের বহুবচন, যাহার অর্থ (১) শব্দ (২) চিন্তাধারা—মনন, চিন্তন বা অন্তরের আলোচনা ও গবেষণা (৩) আদর্শ বা নীতি নির্দ্ধারক বাক্য ও বচন। যেমন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ"কে "কলেমা তৈয়্যব" বলা হয়।

হযরত (দঃ) বলিতেছেন—ব্যাপক পরিধিময় চিন্তা বলে ব্যাপক পরিধিময় আদর্শ ও নীতি ব্যাপক অর্থের শব্দাবলীতে রচিত ও প্রকাশিত করার বিশেষ শক্তি ও গুণ আল্লাহ তায়ালা খাছ ভাবে আমাকে দান করিয়াছেন, অন্য কোন নবীরও এই ক্ষমতা বা গুণ ছিল না।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই সারগর্ভময় উক্তিটির সঠিক মর্য্যাদা দান করিলেই মূল প্রশ্নটির মীমাংসা হইয়া যায়। মনে হয় যেন হযরত (দঃ) এই শ্রেণীর প্রশ্নের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উক্ত তথ্যটি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা ও গুণ হইতে নিঃসৃত চিন্তাধারা, আদর্শ ও বাক্যাবলীর ব্যাপক পরিধি দেশ, কাল ও যুগ নির্বিশেষে

সকলকে বেষ্টিত করিবে ইহাই হইল হযরতের উক্ত সারগর্ভময় উক্তিটির সার্থকতা এবং এই জন্যই হযরত (দঃ) এই বিষয়টিকে গুরুত্বের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন।

বস্তুতঃ এই ধরণের গুণ অন্যান্য নবীগণের জন্য আবশ্যকও ছিল না, কারণ তাঁহাদের আবির্ভাব বিশেষ জাতি ও কালের জন্য সীমাবদ্ধ রূপের ছিল। পক্ষান্তরে (১) হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)এর আবির্ভাব হইল দেশ, কাল, জাতি, যুগ নির্বিশেষে বিশ্ব-মানব জাতির জন্য (২) এবং তাঁহার রেছালত, নবুয়ত ও পয়গাম্বরী কায়েম থাকিবে জগৎ-জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত। এই দুইটি বিষয়কেই হযরত (দঃ) পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্যরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। হযরতের আদর্শ যদি দেশ, কাল, যুগ ও জাতি নির্বিশেষের জন্য না হয় তবে এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের সংবিধান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

হাদীছ সংরক্ষণে বিশেষ তৎপরতা

হাদীছ লিপিবদ্ধ হওয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগ হইতেই তাঁহার প্রতিটি হাদীছ বিশেষভাবে সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, ইহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। ছাহাবীগণ অত্যধিক তৎপরতার সহিত হাদীছ কণ্ঠস্থ ও সংরক্ষণের প্রতি সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। অবশ্য বিশেষ কারণাধীনে উহা ব্যাপকভাবে লিপিবদ্ধ করা হইত না। কারণটি এই যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জমানায় কোরআন শরীফ ক্রমান্বয়ে নাযিল হইতেছিল এবং ব্যাপকভাবে কোরআনের প্রতিটি অক্ষর লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হইত। এমনকি স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) সদা-সর্বদা চারজন বিশেষজ্ঞ লেখককে এ কার্য্যের নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখনই কোন আয়াত নাজেল হইত তৎক্ষণাৎ স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদের একজনকে ডাকিয়া উহা লিপিবদ্ধ করাইতেন। এই চারজন ছাড়া আরও অনেকেই লিখিয়া রাখিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মোসলমানই উহা কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন। অবশ্য সেই যুগের রীতি অনুযায়ী অস্থি, বৃক্ষ-পত্র, প্রস্তর, চামড়া ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তুর উপরে ঐ সকল আয়াত লিখিয়া রাখা হইত। কিতাব বা পুস্তক আকারে একত্র সন্নিবেশিত-রূপে লেখা হইত না। যেহেতু কোরআন শরীফ বিভিন্ন আকারে অঙ্কিত থাকিত, একত্রিতভাবে পুস্তক আকারে সুবিন্যস্ত ছিল না, সেই জন্য কোরআনকে বিশেষভাবে সংরক্ষিত রাখার অভিপ্রায়ে রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি বিশেষ ব্যবস্থা ও সতর্কতামূলক পন্থা হিসাবে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন যে—কোরআন শরীফের ন্যায় ব্যাপকভাবে ও বিশেষ তৎপরতার সহিত হাদীছকেও লিপিবদ্ধ করা সাময়িকভাবে নিষেধ করিয়া দিলেন। কারণ সর্বসাধারণের ভাষা ও বক্তব্য ইত্যাদি এবং কোরআনের ভাষা ও বক্তব্যের মধ্যে গুণ, মর্য্যাদা ও বিশেষত্বের দিক দিয়া তারতম্য ও পার্থক্য করা যেরূপ দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর হাদীছ ও কোরআনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় ততটা সহজ বোধগম্য ও স্পষ্ট নহে। যেমন, আরবী ভাষার গুণাগুণ ও মর্য্যাদা আলোচনার বিশেষ শাস্ত্র এল্‌মুল-বালাগাতেও এই সত্য স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, কোরআন ও হাদীছ উভয়ের আসল উৎস-মূল একই; যেমন পূর্বে বলা হইয়াছে। এবং ভাষাগুণও আল্লাহ তায়ালা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বিশেষভাবে দান করিয়াছেন—اوتيت جوامع الكلم। সুতরাং এইরূপ নিকটতম সৌসাদৃশ্যমূলক দুইটি বস্তু যদি একই সময়ে তাও আবার প্রত্যেকটী স্বতন্ত্র গ্রন্থ বা কিতাবের আকারে নয়, বরং সেকালের রীতি অনুযায়ী বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ধরণের চর্ম-খণ্ড, প্রস্তর-খণ্ড,

অস্থি-খণ্ড বা পত্র ইত্যাদিতে লিখিত ও সংগৃহীত হইতে থাকে, তাহা হইলে তদবস্থায় উভয়ের মধ্যে পরস্পর সংমিশ্রণ ঘটিয়া যাওয়ার আশঙ্কা খুবই প্রবল। অতএব, এই সাময়িক অজুহাতের দরুণ অর্থাৎ কোরআনকে পূর্ণ সতর্কতার সহিত স্বতন্ত্র ভাবে প্রথমে ভালরূপে সকলের হৃদয়ঙ্গম ও পরিচিত করাইবার জন্য হাদীছ ব্যাপকভাবে লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ করা হয়। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জমানায় ব্যাপকভাবে হাদীছ লিপিবদ্ধ করা হয় নাই।

বলা বাহুল্য—এই নিষেধাজ্ঞাই রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর অনুরাগী ছাহাবীদের জন্য হাদীছ সংরক্ষণের কাজে বিশেষ যত্নবান হওয়ার প্রতি অধিক সহায়ক হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা রসুলুল্লাহ (দঃ)এর প্রতিটি হাদীছকে অক্ষরে অক্ষরে মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে অত্যধিক সচেষ্ট হইলেন। এমনকি যেহেতু হাদীছ লিপিবদ্ধ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞার অর্থ ছিল যে, কোরআন শরীফের ন্যায় ব্যাপকভাবে লেখা যাইবে না, সেই জন্য কোন কোন ছাহাবী হাদীছ লিখিয়া মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন এবং দরকার অনুযায়ী সুনিশ্চিত হইবার উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে পুনরায় শুনাইয়া পরিপক্ক ও বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া লইতেন। আনাছ (রাঃ) ও আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তাঁহারা বলিতেন—

هذا احاديث سمعتها من رسول الله وعرضتها عليه

"এই সমস্ত হাদীছ আমি নিজে রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর মুখে শুনিয়াছিলাম ও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে শুনাইয়াছিলাম।" আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিতেন—আমার নিকট যত বেশী হাদীছ সংরক্ষিত আছে ইহার চাইতে অধিক হাদীছ অন্য কোনও ছাহাবীর নিকট আছে বলিয়া মনে করি না। তবে হাঁ। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-এর নিকট অধিক হাদীছ থাকিতে পারে। কারণ তিনি হাদীছ লিখিয়া রাখিতেন, আমি হাদীছ লিখিতে বিশেষ তৎপর ছিলাম না।

আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছসমূহ যাহা পরবর্তী মোসলেম সমাজ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে উহার সংখ্যা ৫৩৭৪। আবু হোরায়রা (রাঃ) নিজেই বলিতেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা আমার হাদীছের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে। এত অধিক সংখ্যক হাদীছ বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে আমরের এই ঘটনা প্রসিদ্ধ এবং প্রমাণিত আছে যে, তিনি রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট হইতে শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গেই হাদীছ সমূহ এক একটি করিয়া লিখিয়া রাখিতেন। এমনকি তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার মুখ হইতে শ্রুত সমুদয় বার্তাই কি লিখিয়া রাখিব? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। আমি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনার স্বাভাবিক অবস্থা ও ক্রোধাবস্থা উভয় অবস্থার বার্তা সবই লিখিব কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হাঁ; এবং তিনি স্বীয় ঠোঁটের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, এই ঠোঁটদ্বয়ের মধ্য হইতে কোন অবস্থাতেই না-হক কথা বাহির হয় না।

ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর বর্তমানে তাঁহারই নির্দেশে যে, বহু সংখ্যক হাদীছ লিখিয়াছিলেন তাহা কিতাব বা পুস্তক আকারে লিখিত হইয়াছিল, সেই কিতাবের নাম ছিল—"ছাদেকাহ" সত্যের প্রতীক; যাহার হাদীছ সংখ্যা ৫৩৮৪ এরও উর্দ্ধে হইতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ যুগের প্রবাহ সেই অমূল্য রত্ন পুস্তিকাখানা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া দিয়াছে, কিন্তু উহার সঙ্কলক আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ছাহাবীর বর্ণিত বহু সংখ্যক হাদীছ পূর্ব যুগের মোহাদ্দেছগণের মাধ্যমে আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার বর্ণিত প্রায় ৭০০ হাদীছ বর্তমান কিতাবসমূহে রহিয়াছে।

বিশ্বের ন্যায়-বিচারক ও জ্ঞানীগণ চিন্তা করুন। দুনিয়ার কোন সাক্ষ্যদাতা কি তাঁহার সাক্ষ্যের বিষয়বস্তুকে এরূপ তৎপরতার সহিত সংরক্ষণ করিয়া থাকে? অথচ দুনিয়ার সব কিছুই সাক্ষ্যের উপর

নির্ভরশীল। ছাহাবী, তাবেয়ী ও তাবয়ে'-তাবেয়ীগণ বিশেষ তৎপরতার সহিত হাদীছকে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। অতএব, তাঁহাদের সাক্ষ্যের দ্বারা হাদীছ প্রমাণিত হওয়ার মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করা সীমাহীন ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পূর্ব বর্ণনায় স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর বর্তমানেই হাদীছ লিখিত হইয়া থাকিত, এমনকি স্বয়ং তাঁহার আদেশে পুস্তিকা আকারেও লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু যাবৎ কোরআন শরীফ গ্রন্থাকারে একত্রিতরূপে সংরক্ষিত এবং প্রতিটি আয়াতের সহিত মোসলমানগণ পূর্ণরূপে পরিচিত না হইয়াছিল তাবৎ নবী (দঃ)-এর নিষেধ অনুযায়ী হাদীছকে ব্যাপকভাবে লিপিবদ্ধ করা এবং পুস্তক আকারে প্রচার করার প্রতি তৎপরতা অবলম্বিত হয় নাই। বরং ব্যক্তিগত পাণ্ডুলিপিরূপে রক্ষিত অবস্থায় এবং সাধারণ্যে পূর্বালোচিত সন্দেহমুক্ত মৌখিক সাক্ষ্যের উপরই সূত্র-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল।

হাদীছ সংরক্ষণের দ্বিতীয় ধাপ :

তারপর যখন প্রথমে আবু বকর (রাঃ) এবং পুনরায় তৃতীয় খলীফা ওসমান (রাঃ) কোরআন শরীফকে সরকারী পরিচালনাধীনে একটি পূর্ণ গ্রন্থাকারে একত্রিত করিবার সুবন্দোবস্ত করিলেন এবং মোসলমানগণ দিন দিন কোরআনের প্রতিটি আয়াতের সহিত পূর্ণ পরিচিত হইয়া গেলেন, এদিকে মোসলমান শাসনকর্তা খলীফাগণও ইসলামী রাষ্ট্রের মূলে কুঠারাঘাতের সমস্ত রকমের ঝড়-ঝঞ্ঝা ও ঝামেলা হইতে মুক্ত হইলেন, তখন ৯৯ হিজরী সনে অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর এন্তেকালের শতাব্দীর মধ্যেই মাত্র ৮৯ বৎসর পরে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁহার মহত্ত্ব ও গুণাবলী আজ চৌদ্দশত বৎসর পরেও বিশ্ব-ইতিহাসের আকাশে দীপ্ত সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও ভাস্কর। এবং তাঁহার অসাধারণ গুণরাজি ও মহত্ত্বের দরুণ বিশ্ববাসী তাঁহাকে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের শীর্ষস্থানীয় চারি-রত্ন খোলাফায়ে-রাশেদীনের সংলগ্নস্থানে অভিষিক্ত করতঃ পঞ্চম খোলাফায়ে-রাশেদীন উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

এই স্বনামধন্য মহান ব্যক্তি খলীফা হওয়ার পর, তিনি এক মহান কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, কোরআন শরীফ পূর্ণরূপে স্বীয় রূপ ধারণ করিয়া মোসলমানদের নিকট পূর্ণ পরিচিতির আসন লাভ করিয়াছে এবং এক স্বয়ং সম্পূর্ণ কিতাব আকারে একত্রিত হইয়া সর্বত্র পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এখন উহার মধ্যে আর কোন প্রকার সংমিশ্রণের আশঙ্কা আদৌ নাই। সুতরাং তিনি খলীফাতুল-মোসলেমীন হিসাবে সরকারীভাবে স্বীয় পরিচালনাধীনে রসুলুল্লাহ (দঃ)এর ছাহাবীগণ এবং তাঁহাদের শাগের্দগণের নিকট ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডুলিপি আকারে এবং কণ্ঠস্থরূপে রক্ষিত হাদীছ সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া একত্র করার কার্যে অগ্রণী হইলেন। যেহেতু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছের প্রধান কেন্দ্র ছিল পবিত্র মদীনা, সেই জন্য খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) মদীনায় নিযুক্ত গভর্ণর আবু বকর ইবনে হযমকে এই আদেশ পাঠাইলেন—

انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه

فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء

"আমার আদেশ—আপনি তন্ন তন্ন করিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এক একটি হাদীছকে খুঁজিয়া বাহির করুন এবং লিপিবদ্ধ করিতে থাকুন। আমার ভয় হইতেছে, এরূপ না করিলে কালক্রমে এই জ্ঞান-ভাণ্ডার বিলুপ্ত হইয়া যাইবে: এই জ্ঞান-ভাণ্ডারের রক্ষক—ছাহাবী ও তাবেয়ীগণ ভূ-পৃষ্ঠ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।" (বোখারী শরীফ)

সুধীবর্গ। লক্ষ্য করুন—সেকালে বিশ্ব-মোসলেম একটি রাষ্ট্রের অধীনে ছিল। সেই রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বা খলীফাতুল-মোসলেমীন—তাও প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন ব্যবস্থার রাষ্ট্র যেখানে সর্বক্ষমতার একমাত্র অধিকারী প্রেসিডেন্ট হইয়া থাকেন, সেই প্রেসিডেন্ট নিজ পরিচালনাধীন স্বীয় নিযুক্ত গভর্ণরগণের নিকট এরূপ লিখিত আদেশ পাঠাইয়া যে কার্য্য পরিচালনা করিলেন উহা যে কি ধরণের হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পর প্রথম শতাব্দীর শেষ অর্থাৎ দ্বিতীয় শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই হাদীছসমূহ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধকরণের যুগ আরম্ভ হইল এবং সরকারী পরিচালনাধীনেই তাহা আরম্ভ হয়। কথিত আছে—الناس على دين ملوكهم। "রাষ্ট্রের নীতি ও গতির দ্বারা অন্যান্য সমস্ত জনসাধারণ প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে।" সুতরাং সমগ্র মোসলেমজাতিই এই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইল এবং ঘরে ঘরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ খোঁজ করতঃ সাক্ষ্যদাতাদের নিকট হইতে হাদীছসমূহ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার কার্য্যে ব্যাপক সাড়া পড়িয়া গেল। মদীনাবাসী ইমাম মালেক হইতে আরম্ভ করিয়া ইমাম আহমদ ইবনে-হাম্বল, ইমাম আওযায়ী, ইমাম যোহুরী, ইমাম বোখারী, ইমাম মোসলেম, ইমাম তিরমিযি, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাছায়ী প্রমুখ শত শত বিশিষ্ট ইমামগণ রসুলুল্লাহ (দঃ)এর হাদীছসমূহকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করেন। ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ কিতাব "মোয়াত্তা" হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় প্রত্যেক কিতাবই আজ তের শত বৎসরের অধিক কাল হইতে বিশ্বের বুকে গ্রহণীয় হইয়া আসিতেছে।

সেই যুগে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ খুঁজিয়া বাহির করার কিরূপ প্রেরণা মোসলেম সমাজে জাগিয়াছিল তাহার নমুনা বোখারী শরীফের ১২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি হাদীছের ঘটনা পাঠ করিলে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। ঘটনাটি এই—একজন লোক একটি মাত্র হাদীছের জন্য স্বীয় আবাসভূমি মদীনা হইতে প্রায় ৬০০ শত মাইল অতিক্রম করিয়া দামেস্ক শহরে আবুদ-দারদা (রাঃ) ছাহাবীর নিকট হাজির হইলেন, ঐ একটি মাত্র হাদীছে-রসুল ছাহাবীর মুখে শুনিয়া আসাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ছায়ীদ ইবনে-মোছাইয়েব—বিশিষ্ট তাবেয়ী মোহাদ্দেছ বলেন, আমি এক একটি হাদীছের তালাশে একাধারে কয়েক দিন ও কয়েক রাত্র ভ্রমণ করিয়া কাটাইয়াছি।

আবুল-আলীয়া নামক মোহাদ্দেছ বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের যুগের হাদীছ পিপাসুগণের এরূপ পিপাসা ছিল যে, তাঁহারা বছরা শহরে বসিয়া তথাকার লোক মারফৎ কোন একটি হাদীছ লাভ করার পর যদি শুনিতে পাইতেন যে, এই হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী এখনও মদীনায় জীবিত আছেন; তবে সরাসরি ঐ ছাহাবীর মুখে হাদীছটি শুনিবার উদ্দেশ্যে বছরা হইতে সুদূর মদীনায় উপস্থিত হইতেন। বছরা হইতে মদীনার দূরত্ব বহু শত মাইল। তদুপরি স্বয়ং ছাহাবীদের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহাও লক্ষ্য করুন—বোখারী শরীফের ১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, ছাহাবী জাবের (রাঃ) স্বয়ং ছাহাবী হইয়াও একটি মাত্র হাদীছ হাসিল করার জন্য এক মাসের পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। স্বয়ং জাবের (রাঃ) উক্ত ঘটনার বিবরণ দানে বলিয়াছেন, লোক মুখে শুনিতে পাইলাম, সিরিয়ায় অবস্থিত একজন ছাহাবী রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে একটি বিশেষ হাদীছ বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই খবর শুনামাত্র আমি একটি উট ক্রয় করিলাম এবং উহার উপর সওয়ার হইয়া দীর্ঘ এক মাস ভ্রমণ করতঃ মদীনা হইতে সিরিয়ায় পৌঁছিলাম। খোঁজ লইয়া জানিতে পারিলাম—ঐ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওনাইস আনছারী (রাঃ)। আমি তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া একটি লোক

মারফৎ এই খবর পাঠাইলাম যে, জাবের আপনার দ্বারে অপেক্ষারত দণ্ডায়মান। লোকটি ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি আবদুল্লার পুত্র জাবের? আমি বলিলাম—হাঁ। এই খবর শুনামাত্র তৎক্ষণাৎ ঐ ছাহাবী বাহির হইয়া আসিলেন, আমরা উভয়ে কোলাকুলি করিলাম এবং বলিলাম, আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনি বিশেষ একখানা হাদীছ রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে বর্ণনা করিয়া থাকেন, ঐ হাদীছখানা শুনিবার জন্য মদীনা হইতে আপনার নিকট পৌঁছিয়াছি, কারণ ঐ হাদীছখানা আমি স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনিতে পারি নাই। অতঃপর সেই ছাহাবী ঐ হাদীছখানা আমার নিকট বর্ণনা করিলেন। (জামেউল-বয়ান ১৩ পৃঃ)

এইরূপে আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ), আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) এবং আরও ছাহাবীর নামে অধিক আশ্চর্য্যজনক ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, তাঁহারা স্বীয় কণ্ঠস্থ হাদীছের এক একটি বাক্য শুদ্ধির জন্য মদীনা হইতে মিশরে অবস্থানকারী সঙ্গী ছাহাবীর নিকট পৌঁছিয়াছেন। আমরা এ ধরণের ঘটনাকে অতিরঞ্জিত বলিয়া কল্পনা করিব, কারণ ইসলামের প্রাণবস্তু—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ আমাদের হ্রাস পাইয়াছে।

সেই যুগের ইমামগণ এইরূপভাবে শত শত, হাজার হাজার সাক্ষ্যদাতার দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া লক্ষ লক্ষ হাদীছ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং সেই লক্ষ লক্ষ সংগৃহিত হাদীছ হইতে সূক্ষ্মতমরূপে এক একখানা হাদীছ-গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ১০,০০০০০ লক্ষ হাদীছ সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে বাছিয়া ৩০,০০০ হাজার হাদীছ সম্বলিত একখানা হাদীছ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইমাম বোখারী (রঃ) ৬,০০০০০ লক্ষেরও অধিক হাদীছ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৮০০ শত জন সাক্ষ্যদাতার মাধ্যমে প্রায় ৪০০০ হাজার হাদীছ বাছিয়া একত্রিত করিয়া বক্ষ্যমান গ্রন্থ "ছহীহু-বোখারী" সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, ইহারও মূল হইল শুধু মাত্র ২৬০২ বা ২৫১৩টি হাদীছ*। এইরূপে বহু সংখ্যক হাদীছ গ্রন্থ আমাদের হাতে পৌঁছিয়াছে।

ইমাম বোখারীর শিক্ষকতায় ৯০,০০০ হাজারেরও অধিক লোক বোখারী শরীফ শিক্ষা করিয়াছিলেন, সাধারণভাবে এক লক্ষ লোক তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

---

* ৪০০০ এবং ২৬০২ সংখ্যাদ্বয়ের তাৎপর্য্য এই যে, এস্থলে দুইটি জিনিষ—একটি হইল মূল হাদীছ তথা রসুলের বাণী ইত্যাদি, দ্বিতীয় হইল উক্ত হাদীছের সাক্ষ্যদাতাগণের নামের ফিরিস্তি তথা সনদ। বলা বাহুল্য—একটি হাদীছের বিভিন্ন সনদ থাকে, এমনকি এক একজন সাক্ষ্যদাতার বিভিন্নতায় একটি মূল হাদীছের এক এক শত সনদও হইয়া থাকে। হাদীছ শাস্ত্রের পরিভাষায় মূল হাদীছ ও সনদের সমষ্টিকে হাদীছ বলা হয়; এই সূত্রে একটি মূল হাদীছ এক শত বা ততোধিক হাদীছ পরিগণিত হইতে পারে। মোহাদ্দেছগণের সংগৃহীত হাদীছের যে সংখ্যা বর্ণিত হইয়া থাকে তাহা এই পরিভাষার ভিত্তিতেই। বোখারী শরীফে মূল হাদীছের সংখ্যা ২৬০২ কাহারও গণনায় ২৫১৩। উক্ত সংখ্যক মূল হাদীছই পরিভাষিক সঙ্গা মতে প্রায় ৪০০০ সংখ্যায় পরিণত হইয়াছে। তন্মধ্যে বহু সংখ্যক হাদীছ একাধিক স্থানে উল্লেখ হইয়াছে; প্রত্যেক স্থানের হাদীছকে ভিন্ন ভিন্ন গণনা করিলে বোখারী শরীফের হাদীছ সংখ্যা হইবে ৭২৭৫।

ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহে

হাদীছ শাস্ত্রে বিশ্ব-সম্রাট উপাধিতে ভূষিত ইমাম বোখারীর আসল নাম ছিল মোহাম্মদ। তিনি পরিচিত ছিলেন—আবু আবদুল্লাহ নামে। পিতার নাম ছিল—ইসমাঈল, পিতামহের নাম ছিল ইব্রাহীম, প্রপিতামহের নাম ছিল—মুগীরা। ১৯৪ হিজরী ১৩ই শওয়াল শুক্রবার, জুমার নামাযের বাদ তিনি বোখারা শহরে ভূমিষ্ট হন। ২৫৬ হিজরী ১লা শওয়াল শনিবার রাত্রে (শুক্রবার দিবাগত রাত্রে) সমরকন্দের অন্তর্গত খরতঙ্গ নামক গ্রামে ইহ-জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। পর দিন (ঈদের দিন) জোহরের নামাযান্তে সেই গ্রামেই সমাহিত হন। তাঁহার বয়স তখন ১৩ দিন কম ৬২ বৎসর ছিল। মৃত্যুকালে তিনি কোন পুত্র সন্তান রাখিয়া যান নাই। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ পারস্যের অধিবাসী ছিলেন, প্রপিতামহ মুগীরা পারস্য হইতে খোরাসানের বোখারা শহরে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। বাল্যকালেই ইমাম বোখারীর পিতা মারা গিয়াছিলেন। তিনি মাতার নিকটই প্রতিপালিত হন। আহমদ নামে তাঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন। ইমাম বোখারীর পিতাও মোহাদ্দেছ ছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই ইমাম বোখারীর উপর আল্লার বিশেষ রহমত দেখা যাইতে ছিল। বোখারী (রঃ) বাল্যাবস্থায়ই অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার মাতা সে জন্য আল্লার দরবারে দোয়া করিতেন। একদিন তাঁহার মাতা ইব্রাহীম (আঃ-কে স্বপ্নে দেখিলেন, যেন তিনি বলিতেছেন, তোমার কান্নাকাটির দরুণ আল্লাহ তোমার ছেলের চক্ষু ভাল করিয়া দিয়াছেন। নিদ্রাভঙ্গের পর স্বপ্নকে সত্যরূপে দেখিতে পাইলেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি লেখা-পড়া আরম্ভ করার পর দশ বৎসর বয়সে আমার অন্তরে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এল্‌হাম হয় যে, আমি যেন হাদীছ কণ্ঠস্থ করায় তৎপর হই। তখন হইতেই আমি অন্য সব কিছু ছাড়িয়া হাদীছ শিক্ষার প্রতি ধাবিত হইলাম। হাদীছ শিক্ষার জন্য সিরিয়া, মিশর, আল-জাযায়ের, বছরা, কুফা, বাগদাদ, হেজাজ ইত্যাদি দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিলাম। ১৮ বৎসর বয়সে আমি বিবিধ গ্রন্থ সংকলনে ব্যাপৃত হই এবং মদীনায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রওজা পাকের নিকটবর্তী স্থানে বসিয়া, হাদীছের সাক্ষ্যদাতা বা রাবীগণের জীবনেতিহাস রচনায় একখানা কিতাব সংকলন করি। ইমাম বোখারী (রঃ) ৫৬ বৎসর বয়সে নিশাপুর নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করেন। সেখানে তিনি হাদীছের দরস বা শিক্ষা দান করিতেন। দেশময় সমস্ত লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উঠিল; ইহাতে তথাকার কোন কোন মানুষের মধ্যে একটু রেশারেশির ভাব উদিত হইল। তাই বোখারী (রঃ) নিশাপুর ত্যাগ করতঃ বোখারার দিকে ফিরিয়া আসিলেন। দেশের জনগণ ইমামকে পুনরায় স্বদেশে পাইয়া আনন্দের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার সহিত রাজ্যের শাসনকর্তার মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল।

ঘটনা এই ছিল যে—খালেদ ইবনে আহমদ নামক বোখারার তৎকালীন শাসনকর্তা ইমাম বোখারীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, স্বয়ং তিনি বা তাঁহার পুত্রদ্বয় ইমাম বোখারীর সঙ্কলিত কিতাব অধ্যয়ন করিতে চাহেন। ইমাম বোখারী (রঃ) যেন সেই শাসনকর্তা—আমীরের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া এই কার্য্য সমাধা করেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানাইলেন—

انى لا اذل العلم ولا احمله الى ابواب السلاطين فان كانت له حاجة الى شئ منه فليحضرنى فى مسجدى اوفى دارى فان لم يعجبك هذا فانت سلطان فامنعنى من المجلس ليكون لى عند الله عذر يوم القيامة انى لا اكتم العلم -

"দেখুন। আমি কখনও এলেমকে অপমানিত ও হেয় প্রতিপন্ন করিতে পারিব না। (লক্ষ লক্ষ গরীব জনসাধারণকে উপেক্ষা করিয়া) এই মহান রত্ন—এল্‌মকে আমীর-ওমরাদের দরওয়াজার প্রত্যাশী বানাইতে পারিব না। অতএব আমীর সাহেব যদি এল্‌মের প্রতি অনুরাগী ও আকৃষ্ট হইয়া থাকেন তবে তিনি যেন আমার মসজিদ বা বাড়ীতে উপস্থিত হন। আর যদি তিনি আমার এই ব্যবস্থাবলম্বনে অসন্তুষ্ট হন এবং আমার শিক্ষাদান কার্য্যে বাধা প্রদানের মনস্থ করেন তবে আমি সে বিষয় আদৌ শঙ্কিত নহি। কারণ, তাঁহার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যদি আমার এই কার্য্য বন্ধ হইয়া যায় তবে আমি কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট এই বলিয়া ক্ষমার্হ গণ্য হইতে পারিব যে—আমি স্বেচ্ছায় এল্‌ম চর্চা বন্ধ করিয়া দেই নাই।"

শাসনকর্তা আমীর এই নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনার দ্বারা সুফল লাভ না করিয়া কুফলের দিকেই অগ্রসর হইলেন এবং শুধু নিজেরই নহে বরং সমস্ত বোখারাবাসীদের দুর্ভাগ্য টানিয়া আনিলেন। তিনি ইমাম বোখারীর এই ন্যায় সঙ্গত উত্তরে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন, এমনকি বিভিন্ন ছলাকলায় আশ্রয় গ্রহণে বোখারী (র:)কে দেশ ত্যাগে বাধ্য করিলেন।

হাদীছে-কুদসীতে আছে—من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, "যে ব্যক্তি আমার কোন প্রিয়পাত্রের সহিত শত্রুতা ধারণ করে, তাহার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করি!" এখানে ঠিক তাহাই হইল—ইমাম বোখারীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই কিছু দিনের মধ্যে আল্লার অভিশাপে পতিত হইল। কিন্তু ইমাম বোখারী (র:) আর দেশে রহিলেন না। তিনি বোখারা হইতে 'বাইকান্দ' নামক স্থানে চলিয়া গেলেন। এই সময় সমরকন্দের লোকেরা ইমাম বোখারী (র:)কে সমরকন্দ আগমনের জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইলেন। সেমতে তিনি সমরকন্দের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে "খরতঙ্গ" নামক গ্রামে যেখানে তাঁহার কিছু আত্মীয়-স্বজনের বসবাস ছিল, তথায় তিনি অবস্থান করিলেন। অত:পর তিনি সমরকন্দ মুখী পুন: যাত্রা করিবেন—এমতাবস্থায় সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার আগমন সম্পর্কে সমরকন্দবাসীদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সংবাদে তিনি অত্যন্ত দু:খিত হইলেন এবং সেই যাত্রা ভঙ্গ করিয়া দিলেন।

ইমাম বোখারী (র:) উল্লিখিত ঘটনা সমূহের দ্বারা ব্যথিত হইয়া দুনিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন। একদা তিনি তাহাজ্জুদ নামাযের পর এই বলিয়া আল্লাহ তায়ালাকে ডাকিলেন—

اللهم قد ضاقت على الارض بما رحبت فاقبضنى اليك

"হে আল্লাহ! এই সুপ্রশস্ত জগৎ আমার জন্য সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, অতএব হে প্রভু! তুমি আমাকে আপন কোলে উঠাইয়া লও।" আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মাহবুব—ইমাম বোখারীর এই ডাক ব্যর্থ হইতে দিলেন না। তাঁহার আবদার পূরণ করা হইল এবং মাত্র এক মাসের মধ্যেই হাদীছ শাস্ত্রের সুনির্মল গগণ হইতে এই জ্যোতিষ্মান সূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হইয়া গেল।

رحمه الله تعالى وادخله جنة الفردوس

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে আদম নামক এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন—এক রাত্রে আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি স্বীয় ছাহাবীগণের এক জমাত সহ একস্থানে অপেক্ষমান অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন? আমি রসুলুল্লাহ (দ:)কে সালাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ (দ:)! আপনি কাহার অপেক্ষায় এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন? রসুলুল্লাহ (দ:) বলিলেন, মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলের অপেক্ষা করিতেছি। স্বপ্ন বর্ণনাকারী বলেন, কিছু দিন পরে

যখন আমি ইমাম বোখারীর মৃত্যু সংবাদ শুনিতে পাইলাম তখন হিসাব করিয়া দেখিলাম, আমি যে সময় স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম ঠিক সেই সময়ই ইমাম বোখারীর মৃত্যু হইয়াছিল। এই স্বপ্নের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, ইমাম বোখারীর পবিত্র আত্মা ইহকাল ত্যাগ করিয়া পরকালের অতিথি হইলে পর স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবীগণকে লইয়া এই অতিথির অভ্যর্থনা করেন। হাদীছে আছে—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখে, সে প্রকৃত প্রস্তাবে আমাকেই দেখিয়া থাকে; কেননা শয়তান কখনও আমার রূপ ধারণ করিতে পারে না।

গালেব ইবনে জিব্রিল নামক খরতঙ্গ গ্রামবাসী—ইমাম বোখারী (রঃ) যাঁহার আতিথেয়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন—ইমাম বোখারীকে কবরের মধ্যে রাখা মাত্রই কবরের চতুষ্পার্শ্বে মেশ্‌কের ন্যায় সুঘ্রাণ ও সুবাস ছড়াইতে লাগিল এবং ঐ সুবাস বহুদিন স্থায়ী ছিল। দেশ-বিদেশের লোক জেয়ারতের জন্য আসিয়া কবরের মাটি নেওয়া আরম্ভ করিল, এমনকি আমরা অবশেষে ঐ কবরকে মজবুত বেষ্টনী দ্বারা রক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম।

ইমাম বোখারী (রঃ) স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন, যৌবনের প্রারম্ভে একদা স্বপ্নে দেখিলাম—আমি একটি পাখা হাতে লইয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছি এবং ঐ পাখার দ্বারা রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে মশা-মাছি ইত্যাদি হটাইয়া রাখিতেছি। ভাল একজন তা'বীর বর্ণনাকারীর নিকট এই স্বপ্ন ব্যক্ত করিলে তিনি আমাকে বলিলেন—তুমি এমন কোন কাজ করিবে যদ্দারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি মৌজু' বা জাল ও মিথ্যা হাদীছের সম্বন্ধ করার মূল উৎপাটিত হইয়া যাইবে। ইহা শুনিয়া আমার মনে প্রেরণা জাগিল যে, আমি এমন একখানা কিতাব লিখিব যাহার মধ্যে সন্দেহমুক্ত ছহীহ্ হাদীছ থাকিবে; যে হাদীছ সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকিবে উহা গ্রহণ করিব না। এইরূপ মনস্থ করিয়া আমি পবিত্র মক্কা শরীফের মসজিদে-হারামে বসিয়া এই কিতাব লিখিতে আরম্ভ করি।

তিনি আরও বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এই কিতাবের মধ্যে প্রতিটি হাদীছ এতদূর সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিয়াছি যে, আল্লাহ প্রদত্ত স্বীয় ক্ষমতা, জ্ঞান, এল্‌ম ও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রতিটি হাদীছকে সূক্ষ্মরূপে বাছিয়া ও পরখ করিয়া লওয়ার পরেও প্রত্যেকটি হাদীছ লিখিবার পূর্বে গোছল করতঃ দুই রাকাত নামায পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট এস্তেখারা করার পর যখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, এই হাদীছটি সন্দেহ-লেশহীন ও ছহীহ্ তখনই আমি উহাকে আমার এই কিতাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি, ইহার পূর্বে নহে। এই কিতাবের পরিচ্ছেদ সমূহ পবিত্র মদীনায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রওজা পাকের নিকটবর্তী বসিয়া সাজাইয়াছি এবং প্রতিটি পরিচ্ছেদ লিখিতেও দুই দুই রাকাত নামায পড়িয়াছি। এইরূপে আমি স্বীয় কণ্ঠস্থ ছয় লক্ষ হাদীছ হইতে বাছিয়া ষোল বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই কিতাবখানা সঙ্কলন করিয়াছি—এই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া যে, আমি যেন এই কিতাবখানাকে লইয়া আল্লার দরবারে হাজির হইতে পারি।

আরও কতিপয় শুভ স্বপ্ন:

নজ্‌ম ইবনে ফোজাইল নামক বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ বর্ণনা করিয়াছেন, আমি স্বপ্নে দেখিলাম—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় রওজা শরীফ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন এবং বোখারী (রঃ) তাঁহার পিছনে পিছনে হাঁটিতেছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) যে যে স্থানে পা রাখিয়া হাঁটিতেছেন ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁহার পিছনে ঠিক ঠিক ঐ স্থান সমূহে পা রাখিয়া হাঁটিতেছেন। বোখারা নিবাসী আবু হাতেম নামক বিশিষ্ট ব্যক্তিও এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা দিয়াছেন।

ইমাম বোখারীর একজন বিশিষ্ট শাগের্দ বর্ণনা করিয়াছেন—আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে স্বপ্নে দেখিলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথায় যাইতেছ? আমি আরজ করিলাম, মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলের নিকট যাইতেছি। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাঁহাকে আমার সালাম বলিও।

আবু যায়েদ মারওয়াযী নামক প্রসিদ্ধ একজন মোহাদ্দেছ বর্ণনা করিয়াছেন—একদা আমি পবিত্র কা'বা-ঘরের সংলগ্ন স্থানে শুইয়াছিলাম, তদবস্থায় স্বপ্নে দেখিলাম—রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিতেছেন, হে আবু যায়েদ। তুমি কত কাল ইমাম শাফেয়ীর কিতাব পড়াইতে থাকিবে, আমার কিতাব পড়াও না কেন? আমি আরজ করিলাম—হুজুর! আপনার কিতাব কোন্‌টি? হযরত (দঃ) উত্তরে ফরমাইলেন, মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল যে কিতাবখানা সঙ্কলন করিয়াছেন উহাই আমার কিতাব।

একটি জিজ্ঞাসার উত্তর

২২শে ডিসেম্বর ১৯৬৭ ইং মর্ণিংনিউজ ইংরাজী দৈনিকে বাংলা অনুবাদ বোখারী শরীফের মুখবন্ধ হইতে কতিপয় উদ্ধৃতি লইয়া কুমিল্লার জনৈক মুসলিম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ইমাম বোখারী তাঁহার সংগৃহিত বিপুল সংখ্যক হাদীছ হইতে অত্র গ্রন্থে অল্প সংখ্যক গ্রহণ করিলেন অপরগুলি বাদ দিলেন কেন?

১৩ই জানুয়ারী ১৯৬৮ ইং তারিখের দৈনিক আজাদে উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ করা হইয়াছিল; পাঠকদের উপকারার্থে নিম্নে উহার উদ্ধৃতি দেওয়া হইল। মূল প্রশ্নের উত্তরে যে সব তথ্যের আবশ্যক প্রথমে তাহা ক্রমিক নম্বরে বর্ণনা করা হইতেছে—

(১) প্রকৃত প্রস্তাবে হাদীছ উহাই যাহা রসুলে করীম (দঃ)-এর তরফ হইতে আসিয়াছে। আর রসুলে করীমের তরফ হইতে পাওয়া গিয়াছে—সুষ্ঠুরূপে প্রমাণিত ঐরূপ একটি বাক্যও উপেক্ষা করার অবকাশ মোসলমানদের জন্য নাই। কিন্তু সাধারণ ভাবে সাক্ষীগণ তথা রাবীগণ রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নামে যাহা কিছু বর্ণনা করেন প্রাথমিক আলোচনায় ঐ সবকেই হাদীছ আখ্যায় ব্যক্ত করা হয়।

(২) দুনিয়ার সব কিছুই সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভরশীল, কোন কোন সাক্ষ্য মিথ্যা কৃত্রিম, জালও হইয়া থাকে। কিন্তু সেই অজুহাতে সত্য সাক্ষ্যকে উপেক্ষা করিলে জগত অচল হইয়া পড়িবে। সুতরাং সব সাক্ষ্য গ্রহণ করাও যায় না আবার সব সাক্ষ্য উপেক্ষা করাও যায় না। বরং সত্যের মাপকাঠিতে সাক্ষ্যসমূহের মধ্যে বাছনী করিতে হয়।

(৩) বহু সংখ্যাকে সাক্ষ্যের বাছনী করিতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই উহার মধ্যে বিভিন্ন রকম ও প্রকার পরিলক্ষিত হইবে যথা—সত্য ও বিশুদ্ধ সাক্ষ্য, মিথ্যা ও জাল সাক্ষ্য এবং দুর্বল সাক্ষ্য—এর মধ্যেও আবার বিভিন্ন শ্রেণী পাওয়া যাইবে।

হাদীছ শাস্ত্রবিশারদগণ চুলচেরা বিচারে হাদীছ প্রাপ্তির সাক্ষ্য বাছনির মধ্যে নিম্ন রকম বিভক্তি করিয়াছেন। সাক্ষ্যদাতার গুণাবলী ও উহার মান এবং সাক্ষ্য প্রদানের সুষ্ঠুতার ভিত্তিতেই এই বিভক্তি যথা (ক) যে সাক্ষ্যে সত্য ও বিশুদ্ধতার মাপকাঠির সমুদয় গুণাবলী পূর্ণ মাত্রায় এবং উচ্চমানে বিদ্যমান রহিয়াছে। (খ) যে সাক্ষ্যে ঐ গুণাবলী পূর্ণ মাত্রায়ই বিদ্যমান আছে, কিন্তু সাক্ষ্যদাতার স্মৃতিশক্তি ঐ শ্রেণীর উচ্চমান অপেক্ষা কিঞ্চিত হাল্কা। (গ) যে সাক্ষ্যের মধ্যে ঐসব গুণাবলীর অভাব রহিয়াছে, কিন্তু মিথ্যা গণ্য হওয়া বা সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কোন হেতু তথায় নাই। (ঘ) যে সাক্ষ্যের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টিকারী কোন ত্রুটি বা হেতু রহিয়াছে। (ঙ) যে সাক্ষ্যে এমন কোন সাক্ষ্যদাতা রহিয়াছে যাহার সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে নয়, কিন্তু অন্য কোথাও মিথ্যা বলা প্রমাণিত হইয়াছে। (চ) যে সাক্ষ্যে এমন কোন সাক্ষ্যদাতা রহিয়াছে যাহার সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনায় সারা জীবনে একবারও কোন

ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা প্রমাণিত হইয়াছে—এইরূপ ব্যক্তি হাজার তওবা করিলে তাহার সাক্ষ্যে কখনও কোন একটি হাদীছও গ্রহণীয় হইবে না।

(৪) সাক্ষ্যের প্রকার ও শ্রেণী বিভক্তির দ্বারাই পরবর্তী লোকদের জন্য হাদীছরূপে প্রাপ্ত বর্ণনা সমূহকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে যথা—"ক" গ্রুপের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হাদীছ সমূহকে ছহীহ্ (বিশুদ্ধ) হাদীছ বলা হয়, অর্থাৎ এইগুলি যে প্রকৃত প্রস্তাবেই রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর হাদীছ তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে। "খ" গ্রুপের সাক্ষ্যের হাদীছ 'ক' গ্রুপের নিকটবর্তীই কিন্তু দ্বিতীয় নম্বরে; এই হাদীছকে হাছান (ভাল) হাদীছ বলা হয়, অর্থাৎ ইহা সম্পর্কেও বিশ্বাস স্থাপন করা যায় যে, ইহা রসুলুল্লারই (দঃ) হাদীছ। "গ" গ্রুপের সাক্ষ্যের হাদীছকে জয়ীফ (দুর্বল) তথা দুর্বল প্রমাণে প্রাপ্ত হাদীছ বলা হয়। "ঘ" গ্রুপের সাক্ষ্যের হাদীছকে মরদুদ—উপেক্ষণীয়, মোয়াল্লাল—ত্রুটিযুক্ত প্রমাণে প্রাপ্ত হাদীছ বলা হয়। "ঙ" গ্রুপের সাক্ষ্যের হাদীছকে মত্রুক—বর্জনীয় প্রমাণে প্রাপ্ত হাদীছ বলা হয়। "চ" গ্রুপের সাক্ষ্যের হাদীছকে মৌজু'—জালিয়াত সাক্ষীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীছ বলা হয়।

(৫) কালেক্সন—সংগ্রহ করা, ভেরীফিকেশন—বাছনি করা, সিলেক্সেন—গ্রহণ করা এইসব ভিন্ন ভিন্ন স্তরের কাজ। সংগ্রহের সময় মোহাদ্দেছগণ সাধারণতঃ হাদীছ নামে প্রচারিত ও বর্ণিত অনেক কিছুকেই কুড়াইয়া লইতেন। সংগ্রহের স্বাভাবিক নিয়মও তাহাই। অতঃপর বাছনি ও গ্রহণের সময় এক এক মোহাদ্দেছ এক এক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং সেই নীতি পালনের মাধ্যমেই সংগৃহীত সংখ্যার বিরাট অংশ খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে এবং বাছনিকৃত গ্রহণীয় অংশের সংখ্যা কম হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য—উক্ত নীতির কঠোরতার তারতম্যের ভিত্তিতেই বাছনিকৃত গ্রহণীয় অংশের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

স্মরণ রাখিতে হইবে, আমাদের নিকট রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর হাদীছ বলিয়া প্রমাণিত হওয়ার জন্য কৃত্রিম, বর্জনীয়, উপেক্ষণীয় ও দুর্বল শ্রেণীর সাক্ষ্য প্রমাণ দৃষ্টেই হাদীছ নামে বর্ণিত বহু বর্ণনাকে জয়ীফ, মৌজু', মোন্‌কার, মত্রুক ইত্যাদি নামের আখ্যা দেওয়া হয় এবং ঐ সবকে এড়াইয়া চলা হয়। নতুবা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর হাদীছ বলিয়া প্রমাণিত একটি অক্ষরকেও ঐরূপ আখ্যার দ্বারা স্পর্শ করা মোসলমানের পক্ষে অসম্ভব।

(৬) ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাঁহার সংগৃহিত বিপুল সংখ্যক হাদীছ হইতে বাছনি করিয়া শুধু ঐ হাদীছ সমূহকেই গ্রহণ করিয়াছেন যাহা "ক" গ্রুপের সাক্ষ্যে প্রমাণিত, অন্য কোন গ্রুপের হাদীছকে তিনি তাঁহার এই গ্রন্থে শামিল করেন নাই। তার ফলেই ইমাম বোখারীর সর্বমোট সংগৃহিত হাদীছ সংখ্যা এবং এই গ্রন্থের গৃহিত হাদীছের সংখ্যা—উভয় সংখ্যায় বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে এবং এত বড় কঠোর বাছনিই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য।

সাধারণ একজন স্বর্ণকার বা স্বর্ণবণিক তাহার পেশাগত সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা কষ্টি পাথরে ঘর্ষণ করিয়া হাজার হাজার স্বর্ণ-খণ্ডের মান নির্ণয় ও বাছনি করতঃ অল্প সংখ্যক খণ্ড গ্রহণ করেন। তাহার সেই পেশাগত দীর্ঘ সাধনায় অর্জিত অভিজ্ঞতা ও সেই অভিজ্ঞতায় বাছনি কার্যের রহস্যকে পত্র-পত্রিকা মারফৎ হাতড়ানো যে বৃথা চেষ্টা তাহা অতি সুস্পষ্ট। হাদীছ শাস্ত্র ত কত মহান, কত উর্দ্ধের কত সূক্ষ্ম, কত গভীর, কত প্রশস্ত এবং কত বিস্তীর্ণ। এই বিশাল ময়দানে ঐরূপ উদ্যোগ গ্রহণ না করিতে অনুরোধ করি।

——(০)——

সূচী-পত্র

রসূলুল্লার প্রতি অহীর প্রাথমিক বিবরণ ১
নিয়্যতের হাদীছ "
হেরাক্লিয়াস ও আবু সুফিয়ানের প্রশ্নোত্তর ২১
ঈমানের হাকিকত বা তাৎপর্য্য ৩০
হেরাক্লিয়াসের বক্তব্য ঘটনা ৩১
আরও একটি মর্মান্তিক ঘটনা "
রসূলুল্লার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সুফল ৩৩

প্রথম অধ্যায়—ঈমান ৩৪

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিষ ৩৭
ঈমানের শাখা-প্রশাখা "
মোসলমান কে? ৪২
ইসলামের উত্তম স্বভাব কি? ৪৩
ইসলামের বিশিষ্ট ভাল কাজ অন্ন দান ৪৩
ঈমানের একটি বিশেষ শাখা ৪৪
রসূলুল্লার মহব্বত ঈমানের মূল ৪৪
ঈমানের স্বাদ লাভ করার উপায় ৪৫
ঈমানের একটি বিশেষ নিদর্শন ৪৬
ইসলামী জীবনের শপথ ও অঙ্গীকার ৪৬
দ্বীন-রক্ষার্থে সর্বস্ব ত্যাগ করা ৪৭
আল্লার মা'রেফাত অনুপাতে ভয়ের সঞ্চার ৪৭
ঈমানের প্রতি কিরূপ অনুরাগ আবশ্যক ৪৯
ঈমানের পরিমাণ কম-বেশী হওয়ার প্রমাণ ৪৯
লজ্জা-শরম ঈমানের শাখা ৫০
ইসলামের স্বীকারোক্তি এবং নামায ও যাকাত আদায় করিলে মোসলমান গণ্য হবে ৫০
ঈমান একটি প্রধান আমল ৫২
খাঁটি ও অখাঁটি ইসলামের বিশ্লেষণ ৫৪
ব্যাপকভাবে সালাম জারী করা ঈমানের শাখা ৫৬
কুফরের শাখা-প্রশাখা ছোট বড় হয় ৫৭
প্রত্যেকটি গোনাহ কুফরীর শাখা ৫৮
মোনাফেকের নিদর্শন ৬২
লাইলাতুল-কদরে এবাদৎ ঈমানের শাখা ৬৩
জেহাদ করা ঈমানের শাখা ৬৩
তারাবীর নামায ঈমানের শাখা ৬৪
রমযানের রোযা ঈমানের শাখা ৬৪
ইসলাম ধর্ম অতি সহজ ৬৫
নামায ঈমানের একটি বিশেষ অঙ্গ ৭০
খাঁটি ইসলামের উপকারিতা ৭২
আল্লার নিকট অধিক পছন্দনীয় আমল ৭২
আমলে ঈমানের মাত্রা কম-বেশী হয় ৭৩
যাকাত দান করা ইসলামের একটি অঙ্গ ৭৪
জানাযায় যোগদান ঈমানের একটি অঙ্গ ৭৫
আল্লার মহব্বত ও ভয় ঈমানের অঙ্গ ৮০
ঈমান, ইসলাম, এহসান ও কেয়ামতের বয়ান ৮৪
বিশেষ দ্রষ্টব্য—তকদীর কি? ৯০
সন্দেহজনক কাজ হইতে সংযমী হওয়া ৯৪
গণীমতের পঞ্চমাংশ ইসলামী ষ্টেটকে দেওয়া ৯৯
ছওয়াবের নিয়্যতে কাজ করার উপরই ১০২
হিত ও মঙ্গল কামনা বড় ধর্ম ১০২

দ্বিতীয় অধ্যায়—এলম

এলমের ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা ১০৫
কথার মধ্যভাগে প্রশ্নের উত্তরদানে বিলম্ব ১০৭
এলমের কথা দরকার বশতঃ উচ্চৈঃস্বরে বলা ১০৮
ওস্তাদ কর্তৃক শাগের্দগণের পরীক্ষা করা ১০৮
দ্বীনের কথা যোগ্য লোক দ্বারা যাচাই করা ১০৯
অভিজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম বিষয়ে কিছু পাঠাইলে ১১১
এলমের মজলিসে ভিতরে স্থান পাইলে ১১৬
ওস্তাদ অপেক্ষা শাগের্দ অধিক জ্ঞানী হইতে ১১৭
জান ও মালের নিরাপত্তা ১২০
ইজ্জতের নিরাপত্তা ১২১
জ্ঞান, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ১২২
জ্ঞান ও নছিহতের কথা এত বর্ণনা না করা ১২৩
দ্বীনের বুঝ ও জ্ঞান আল্লার বিশেষ নেয়ামত ১২৫
দ্বীনের জ্ঞান ও এলম হাসিলে প্রতিযোগী ১২৬
খিজিরের নিকট মুছার (আঃ) সমুদ্রপথে গমন "
কোরআনের এলম দানের দোয়া করা ১২৬
কি বয়সে জ্ঞাত ঘটনার হাদীছ গ্রহণযোগ্য? ১২৭
এলম হাসিল করিতে বিদেশে যাওয়া ১২৭
শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষাদান করার ফজিলত ১২৯
দ্বীনের এলম উঠিয়া অজ্ঞতার প্রাবল্য ১৩০
কিভাবে এলম উঠিবে? ১৩০
পশুর উপর থাকিয়া মছআলাহ বর্ণনা করা ১৩১
মাথা বা হাতের ইশারায় মছআলার উত্তর ১৩২
পরস্পর পালাক্রমের ব্যবস্থায় শিক্ষা লাভ ১৩২
একটি মছআলার প্রয়োজনে ছফর করা ১৩২
শিক্ষা বা নছীহত দান কালে রাগ করা ১৪০
মুরব্বী ও ওস্তাদের সম্মুখে হাটু গাড়িয়া বসা ১৪১
প্রয়োজনবোধে কোন কথা পুনঃ পুনঃ বলা ১৪২
পরিবারবর্গকে দ্বীন শিক্ষা দিবে "

নারীদেরে দ্বীন শিক্ষায় বিশেষ তৎপরতা ১৪৩
নারীদের শিক্ষার জন্য সময় নির্দ্ধারিত করা "
শ্রোতা কথা না বুঝিলে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিবে ১৪৪
আলেমের নিকট এলম লাভের সুযোগ ১৪৪
হযরত (দঃ)এর নামে মিথ্যা বলা মহাপাপ ১৪৪
এলমের বিষয় লিপিবদ্ধরূপে সংরক্ষণ করা ১৪৫
জ্ঞানের কথা বা নছীহত রাত্রে শিক্ষা দেওয়া ১৪৭
রাত্রিবেলা এলম চর্চা করা ১৪৯
এলম কণ্ঠস্থ করায় তৎপরতা ১৪৯
আলেমগণের বক্তব্য চুপ করিয়া শুনা উচিত ১৫১
কোন আলেমকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়— ১৫১
বসা আলেমকে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করা ১৫৫
মানুষকে এলম সামান্যই দেওয়া হইয়াছে ১৫৫
কোন মুস্তাহাব কার্যে ভুল ধারণা সৃষ্টির আশঙ্কায় উহা বর্জন করা ১৫৬
শ্রোতার জ্ঞান অনুপাতে কথা বলিবে ১৫৭
এলম শিক্ষায় লজ্জা-শরম বাধা না হওয়া ১৫৭
লজ্জা-ক্ষেত্রে মছআলাহ অন্যের দ্বারা জানা ১৫৮
মছজিদে এলমের চর্চা করা ১৫৮

তৃতীয় অধ্যায়—অজু

অজুর বর্ণনা ১৫৯
অজু ব্যতিরেকে নামায হইবে না "
অজুর ফজিলত "
অনুভূতি ছাড়া শুধু সন্দেহে অজু ভাঙ্গে না ১৬০
কারণ বশতঃ অন্য পানি দ্বারা অজু করা ১৬১
উত্তমরূপে অজু করা উচিৎ ১৬৫
অজুর সময় উভয় হাতে মুখ ধুইবে ১৬৬
প্রত্যেক কাজের আরম্ভে বিছমিল্লাহ বলা ১৬৬
পায়খানায় যাইতে কি দোয়া পড়িবে ? ১৬৬
মল-মূত্র ত্যাগের সময় কেবলামুখী বসিবে না ১৬৭
পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা ১৬৯
ডান হাতে এস্তেঞ্জা করা নিষিদ্ধ ১৭০
কুলুখ ব্যবহার করা কর্তব্য ১৭০
লিদ্ দ্বারা কুলুখ ব্যবহার নিষিদ্ধ ১৭০
প্রত্যেক অঙ্গ এক, দুই বা তিনবার ধুইবে ১৭০
অজুর মধ্যে নাকে পানি দেওয়া ১৭৩
অজু-গোসলে ডান দিকের কাজ প্রথম করা ১৭৪
নামাযের সময় হইলে পানি তালাশ করিবে "
মানুষের চুল ভিজান পানি পাক "
যে পাত্রে কুকুর মুখ দিবে উহা ৭ বার ধুইবে ১৭৫
মল-মূত্রের দ্বার দিয়া কিছু বাহির হইলে ১৭৬
অজুর সময় অঙ্গে পানি ঢালিয়া দেওয়া ১৭৭
অজু ছাড়া কোরআন পড়া যায় ১৭৭
বেহুশ না হইয়া মাথায় চক্র আসায় অজু নষ্ট "
অজুর মধ্যে পূর্ণ মাথা মছেহ করা ১৭৮
অজুর ব্যবহৃত পানি অন্য কাজে ব্যবহার "
স্ত্রীর সঙ্গে এক পাত্রে বা কোন মহিলার ব্যবহারের অবশিষ্ট পানি দ্বারা অজু করা ১৭৯
অজুর ব্যবহৃত পানি নাপাক নহে ১৮০
পাথর, কাঠ বা পিতলের পাত্রে অজু করা "
এক সের পরিমাণ পানি দ্বারা অজু করা "
চামড়ার মোজার উপর মছেহ করা ১৮১
গোশত ইত্যাদি খাইলে অজু নষ্ট হয় না "
ছাতু, দুগ্ধ ইত্যাদি খাইয়া কুল্লি করা আবশ্যক "
নিদ্রায় অজু ভঙ্গ হয়, তন্দ্রায় অজু নষ্ট হয় না ১৮২
অজু ভঙ্গ না হইলেও পুনঃ নূতন অজু করা "
প্রস্রাবের ছিটা-ফোটা হইতে সতর্ক না থাকা কবীরা গোনাহ ১৮৩
মধ্যভাগে কাহারও প্রস্রাব বন্ধ করাইবে না "
মসজিদের খালি মাটিতে প্রস্রাব করা হইলে "
শিশুর প্রস্রাব ধৌত করিতে হইবে ১৮৪
কোন ব্যক্তিকে নিকটে রাখিয়া প্রস্রাব করা "
দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা "
কোন স্থানে রক্ত লাগিলে উহা ধুইতে হইবে ১৮৫
কাপড়ে বীর্য্য লাগার স্থান শুষ্ক হওয়ার পূর্বে "
উট, বকরী—হালাল জানোয়ারের প্রস্রাব "
পানি, ঘৃত ইত্যাদিতে নাপাক পড়িলে ১৮৭
অপ্রবাহিত বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা "
নামায অবস্থায় শরীরে নাপাক বস্তু পড়িলে "
থুথু ও কফ লাগিলে কাপড় নাপাক হয় না ১৮৮
কোন প্রকার মাদকীয় বস্তু দ্বারা অজু হয় না ১৮৯
প্রয়োজনে মেয়ে পিতার শরীর স্পর্শ করিবে "
মেছওয়াক করা "
অজু অবস্থায় শয়ন করার ফজিলত ১৯০

চতুর্থ অধ্যায়—গোসল

গোসলের পূর্বে অজু করা ১৯১
স্বামী স্ত্রী একত্রে গোসল করা "
গোসলের পানির পরিমাণ ১৯২
গোসলে তিনবার মাথায় পানি ঢালা "
সমস্ত শরীরে একবার পানি ঢালা "
দুধের হাঁড়ির পানিতে গোসল করা ১৯৩
হাতে নাপাকী না থাকিলে হাত ধুইবার পূর্বে পানির পাত্রে হাত দেওয়া যায় "
একাধিকবার স্ত্রীসঙ্গমের পর গোসল করা ১৯৪
ফরজ গোসলের পূর্বেকার সুগন্ধি থাকায় "

ফরজ গোসল ভুলিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলে ১৯৪
প্রথমে মাথার ডান পার্শ্ব ধৌত করিবে ”
নির্জন গোসলে উলঙ্গ হওয়া যায় ”
নির্জন না হইলে পর্দাবস্থায় গোসল করিবে ১৯৫
নাপাক অবস্থায় ঘাম ও ঐ অবস্থায় চলাফেরা ১৯৬
নাপাক অবস্থায় গৃহে অবস্থান ও শয়ন করিলে ”
স্ত্রী-পুরুষের লিঙ্গ এথনেই গোসল ফরজ হইবে ”

পঞ্চম অধ্যায়—হায়েজ বা ঋতু

হায়েজের আরম্ভ কিরূপে হইয়াছে ১৯৯
ঋতুবতী স্বামীর মাথা ধুইয়া ও আচড়াইয়া ”
হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীর সংস্পর্শনে ২০০
ঋতু অবস্থায় নারীদের সঙ্গে একত্রে শয়ন করা ”
ঋতু অবস্থায় রোজা রাখা নিষিদ্ধ ২০১
ঋতুবতী তওয়াফ ভিন্ন হজ্জের সব করিবে ২০২
এস্তেহাজার বয়ান ২০৩
হায়েজের রক্ত পরিষ্কার প্রণালী ২০৪
হায়েজ অবস্থায় পরিহিত কাপড়ে নামায পড়া ”
হায়েজান্তে গোসলে সুগন্ধি ব্যবহার ”
হায়েজ আরম্ভ ও শেষ হওয়ার নিদর্শন ২০৫
হায়েজ অবস্থায় পরিত্যক্ত নামায পড়িতে ”
ঋতুবতীর ঈদগাহে বা দোয়ার সমাবেশে ২০৬
হায়েজের সময় ছাড়া জরদ ও মেটে স্রাব ২০৯
এস্তেহাজার অবস্থায় হায়েজ শেষে হুকুম ”
ঋতুবতীর সংস্পর্শনে নামাযের ক্ষতি হইবে না ”

ষষ্ঠ অধ্যায়—তায়াম্মুম ২১১

অক্ষমতায় বাড়ীতেও তায়াম্মুম করা যায় ২১৩
ফুঁক দিয়া হাতের মাটি ফেলিয়া তায়াম্মুম করা ”
পাক মাটি পবিত্রতা লাভের বস্তু ২১৪
গোছলে বিপদের আশঙ্কায় তায়াম্মুম ২১৬

সপ্তম অধ্যায়—নামায

নামায ফরজ হওয়ার বিবরণ ২১৮
নামায পড়িতে কাপড় পরা ফরজ ”
একটি মাত্র চাদরে নামায পড়িবার নিয়ম ২১৯
লম্বা চাদরে নামায পড়িবার নিয়ম ২২০
অপ্রশস্ত কাপড়ে কিরূপে নামায পড়িবে ২২০
বিধর্মীদের তৈরী কাপড়ে নামায পড়া ২২১
নামায এবং অন্য অবস্থায়ও উলঙ্গ নিষিদ্ধ ২২২
জামা, পায়জামা, জাঙ্গিয়া, জুব্বা পরিধানে ”
ছতর আবৃত রাখা ফরজ ”
উরু ছতরের অন্তর্ভুক্ত কি-না ২২৩
নারীগণ কিরূপ বস্ত্রে নামায পড়িবে ২২৪
নক্সী বস্ত্রে নামায পড়িলে নক্সার প্রতি ধ্যান করিবে না ২২৫
ক্রুশ-চিত্রের বা অন্য কোন আকর্ষণীয় ছাপের কাপড় সম্পৃক্তে নামায পড়িবে না ২২৫
রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া নামায পড়া ২২৬
লাল রঙ্গের কাপড় পরিধানে নামায পড়া ”
চৌকি ইত্যাদির উপর নামায পড়া ২২৭
চাটাইয়ের উপর নামায পড়া ২২৮
ফরাস ইত্যাদি বিছানার উপর নামায পড়া ২২৯
অধিক উত্তাপে বস্ত্রাংশের উপর সেজদা করা ”
চপ্পল পায়ে রাখিয়া নামায পড়া ”
চামড়ার মোজা পায়ে রাখিয়া নামায পড়া ”
কা'বা দিককে কেবলারূপে গ্রহণ করা ২৩০
নামায কেবলামুখী হওয়ার আবশ্যকতা ২৩১
কেবলা নয় এমন দিকে ভুলবশতঃ নামায ২৩২
মসজিদে থুথু দেখিলে নিজেই পরিষ্কার করা ”
নামাযে থুথু ফেলার আবশ্যক হইলে ২৩৩
ত্রুটিগোচর মোক্তাদীদেরে নামাযান্তে সতর্ক করা ইমামের কর্তব্য ২৩৪
কোন গোত্র-বিশেষের মসজিদ বলা যায় কি ”
মসজিদে কোন বস্তু বণ্টন করা ২৩৪
মসজিদে দাওয়াত করা ও উহা কবুল করা ২৩৫
মসজিদে বিচার বিভাগীয় কাজ করা ”
আবাস গৃহে নামাযের স্থান রাখা চাই ২৩৬
মসজিদে ডান পা প্রথমে রাখিবে ২৩৭
যে স্থানে কবর আছে তথায় নামায পড়া ও কাফেরদের কবর স্থানে মসজিদ তৈয়ার করা ”
বকরী, উট ইত্যাদি জন্তুর নিকটে নামায পড়া ২৩৯
আল্লার গজবে ধ্বংস স্থান এড়াইয়া নামায ২৪০
আশ্রয়হীন নারীকে মসজিদে আশ্রয় দেওয়া ”
প্রয়োজনে পুরুষ মসজিদে নিদ্রা যাইতে পারে ২৪১
বিদেশ হইতে বাড়ী ফিরিয়া নামায পড়া ২৪২
মসজিদে বসিবার পূর্বে ২ রাকাত নামায পড়া ”
মসজিদের ভিতরে অজু ভঙ্গ করা দূষণীয় ”
মসজিদ তৈরী কিরূপ হওয়া ভাল ”
মসজিদ তৈরীতে সাহায্য গ্রহণ করা ২৪৪
মসজিদ বা উহার জিনিষ তৈরী করিতে কারিগরের সাহায্য ২৪৫
মসজিদ তৈরী করার ফজিলত ২৪৬
মসজিদে সতর্কতার সহিত চলিবে ”
মসজিদে ভাল কবিতা পাঠ করা ”
মসজিদে (জেহাদ শিক্ষায়) অস্ত্র চালনা ”

মসজিদে ঋণ আদায়ের তাগিদ করা ২৪৭
মসজিদ ঝাড়ু দেওয়া ও পরিষ্কার করা ”
মসজিদের জন্য খাদেম রাখা ”
কয়েদীকে মসজিদের খুঁটির সহিত বাঁধা ”
(নিরাশ্রয়) রুগ্নকে মসজিদে আশ্রয় দেওয়া ২৪৯
মসজিদে বাড়ীর দরওয়াজা কাটা বা যাতায়াতের রাস্তা করা ”
মসজিদে কপাট ও তালা-চাবির ব্যবস্থা রাখা ২৫০
মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা ২৫১
মসজিদে উর্দ্ধমুখী হইয়া শোয়া ”
মসজিদে বা অন্যত্র তশবীক করা ২৫২
মক্কা-মদীনার রাস্তায় মসজিদ ও রসুলুল্লার নামায স্থান সমূহের বর্ণনা ২৫৪
ইমামের সম্মুখে ছোতরা মোক্তাদীদের যথেষ্ট ২৫৬
ছোতরা কতটুকু ব্যবধান রাখিবে ? ”
মসজিদের খুঁটি সম্মুখীন নামায পড়া ২৫৭
আরোহণের পশু বা বৃক্ষ সম্মুখী নামায পড়া ”
খাট, চৌকি ইত্যাদি সম্মুখী নামায পড়া ২৫৮
নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া গমনে বাধা দিবে ”
নামাযীর সম্মুখ দিয়া গমন করা বড় গোনাহ ২৫৯
ছোট শিশুকে কাঁধে লইয়া নামায পড়া ”
নামাযের ওয়াক্ত নির্দ্ধারণ ২৬৩
নামাযের দ্বারা গোনাহ মাফ হইয়া থাকে ২৬৪
ওয়াক্তমত নামায আদায় করার ফজিলত ২৬৯
ওয়াক্তমত নামায না পড়া নামাযকে নষ্ট করা ”
গ্রীষ্মকালে তাপ কমিলে জোহর নামায পড়িবে ”
ওজর বশতঃ জোহরের নামায বিলম্বে পড়া ২৭৩
আছরের নামায পড়ার সময় ২৭৪
আছরের নামায ছুটিয়া যাওয়ার ক্ষতি ২৭৭
আছরের নামায ছাড়িয়া দেওয়ার গোনাহ ”
আছরের নামাযের ফজিলত ”
সূর্য্যাস্তের পূর্বে আছরের ওয়াক্ত অল্প পাইলে ২৭৮
মাগরেবের নামাযের ওয়াক্ত ২৭৯
মাগরেবকে এশা বলিবে না ”
এশার নামাযের ফজিলত ২৮০
প্রয়োজন ছাড়া এশার পূর্বে নিদ্রা যাইবে না ২৮১
ঘুমের ভাবে বাধ্য হইলে এশার পূর্বে ঘুমাইবে ”
এশার নামাযের ওয়াক্ত মধ্যরাত্র পর্যন্ত থাকে ২৮২
ফজরের নামাযের ফজিলত ২৮৩
ফজরের নামাযের ওয়াক্ত ”
যে কোন নামাযের এক রাকাত পড়ার সময় পাইলেই ঐ নামায ফরজ হইয়া যাইবে ২৮৩
ফজরের নামায পড়ার পর সূর্য্য পূর্ণ উদিত হওয়ার পূর্বে নফল নামায পড়িবে না ২৮৪
আছরের নামায পড়ার পর নফল পড়া নিষিদ্ধ ”
সূর্য্য উদয় ও অস্তের সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ ”
আছরের নামাযের পর কাযা পড়া জায়েয ২৮৫
একদল লোকের নামায কাজা হইলে আজান ও জমাতে ঐ কাজা নামায পড়িতে পারে ২৮৬
নামাযের ওয়াক্ত চলিয়া গেলে স্মরণ হওয়া মাত্রই নামায পড়িবে ২৮৮
এশার পরে পরিবারবর্গের সহিত কথা বলা ২৮৮

আজানের বিবরণ

মোসলমানদের মধ্যে আজানের প্রচলন ২৯১
আজানের ফজিলত ২৯৩
উচ্চৈঃস্বরে আজান দেওয়া উচিত ”
বস্তী হইতে আজান শুনা গেলে তথায় আক্রমণ করিবে না ২৯৪
আজানের শব্দ শুনিয়া কি বলিবে ”
আজান শুনিয়া কি দোয়া পড়িবে ? ২৯৫
আজান দেওয়ার ফজিলত ”
আজানের মধ্যে কথা বলা ”
কেহ সময় বলিয়া দিলে অন্ধ ব্যক্তি আজান দিতে পারে ২৯৬
আজান ও একামতের ব্যবধানের পরিমাণ ”
আজানের পর ঘরে থাকিয়া একামতের প্রত্যেক আজান ও একামতে নফল পড়া ভাল ২৯৭
ছফরেও আজান দিয়া জামাতে নামায পড়া ২৯৮
আজান দিবার সময় মুখ উভয় দিকে ঘুরাইবে ২৯৯
নামাযে ছুটাছুটি করিয়া আসিবে না ”
মোক্তাদী নামাযে কোন্ সময় দাঁড়াইবে ৩০০
একামতের পর ইমামের কথা বলা ৩০১
জমাতের সহিত নামায পড়া ওয়াজেব ”
জমাতের সহিত নামাযের ফজিলত ”
প্রখর রৌদ্রে জোহরের জন্য মসজিদে যাওয়া ৩০৩
মসজিদে আসিতে প্রতি পদে ছওয়াব ৩০৪
এশা ফজরের জমাতে হাজির হওয়ার তাকিদ ”
ইমামের সঙ্গে একজন মোক্তাদী হইলেই জমাত গণ্য হইবে ”
মসজিদে নামায পড়া ও নামাযের জন্য বসা ৩০৫
সকালে-বিকালে মসজিদে যাওয়ার ফজিলত ৩০৬
ফরজ নামাযের একামত হইলে সুন্নত বা নফল আরম্ভ করিবে না ৩০৬
অসুস্থ অবস্থায় জমাতে শরীক হওয়া ৩০৭
খাবার উপস্থিত, জমাতও আরম্ভ ৩০৮

সাংসারিক কাজের জন্য জমাত ছাড়িবে না ৩০৯
এলম-মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিই ইমাম হবে ৩১০
নিযুক্ত ইমাম উপস্থিত না থাকায় অন্য ইমাম জমাত আরম্ভের পর প্রথম ইমাম আসিলে ৩১১
মোক্তাদী কোন্ সময় সেজদায় নত হইবে ৩১৩
রুকু-সেজদায় ইমামের পূর্বে উঠিবার পরিণতি ৩১৪
ক্রীতদাস ইমামতি করিতে পারে ”
ইমাম নামায পূর্ণাঙ্গ করে নাই, মোক্তাদী পূর্ণাঙ্গ করিয়াছে ৩১৪
বিদ্রোহীদের নিযুক্ত ইমামের মোক্তাদী হওয়া ৩১৫
এরূপ দীর্ঘ কেরাত পড়িবে না, যাহাতে কর্মব্যস্ত ব্যক্তিগণ জমাতে যোগদানে বিরত থাকে ৩১৬
একাকী দীর্ঘ নামায পড়িতে পারে ৩১৭
কম সময় নামায পড়িলেও আরকান-আহকাম সুষ্ঠুরূপে আদায় করিবে ৩১৭
কোন কারণে অল্প সময়ে নামায শেষ করা ”
নামাযে কাঁদিলে ৩১৮
একামত আরম্ভেই কাতার সোজা করিবে, প্রয়োজনে পরেও উহার জন্য তৎপর হইবে ৩১৮
কাতার সোজা করিতে ইমাম দৃষ্টি রাখিবে ”
কাতার সোজা করা নামাযের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ৩১৯
কাতার সোজা এবং পূর্ণ না করা গোনাহ ”
লাগালাগি সারি বাঁধিবে ফাঁক রাখিবে না ”
মহিলা পেছনে দাঁড়াইবে ৩২০
ইমাম-মোক্তাদীদের মধ্যে আড়াল থাকিলে ”
নামাযের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থানে হাত উঠাইবে এবং কতদূর উঠাইবে ৩২২
নামাযে দাঁড়ান অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখিবে ৩২৩
নামাযে আল্লার ধ্যান বজায় রাখা কর্তব্য ”
নামায আরম্ভে তকবীর বলার পর কি পড়িবে ৩২৪
নামাযে উপরের দিকে তাকান জায়েয নহে ৩২৫
নামাযে এদিক-ওদিক দেখা জায়েয নহে ”
নামাযে প্রত্যেকের কেরাত পড়া ওয়াজেব ”
বিভিন্ন নামাযের মধ্যে কেরাতের বিবরণ ৩২৭
ছুরার অংশবিশেষ বা ১ রাকাতে ২ ছুরা পড়া ৩৩০
আমীন বলার ফজিলত ও নিয়ম ৩৩১
কাতারে শামিল না হইয়া নিয়্যত বাঁধা ৩৩২
নামাযে প্রত্যেক উঠা-বসায় তকবীর বলিবে ”
রুকুতে হাঁটুর উপর হাতদ্বয়ের ভর করিবে ৩৩৩
রুকু-সেজদা ভালরূপে না করার পরিণতি ”
রুকু-সেজদায় কত সময় অবস্থান করিবে ৩৩৪
ভালরূপে রুকু-সেজদা না করিয়া নামায পড়িলে ঐ নামায পুনরায় পড়িবে ৩৩৪
রুকু-সেজদার মধ্যে দোয়া করা ৩৩৫
রুকু হইতে উঠাকালে ইমাম কি বলিবে ? ৩৩৬
রুকু হইতে উঠিয়া সোজা ভাবে দাঁড়াইবে ”
তকবীর বলার সঙ্গেই রুকু-সেজদায় যাইবে ৩৩৭
সেজদার মহত্ব ও ফজিলত ৩৩৮
সেজদায় রাহু পাঁজর হইতে ব্যবধানে রাখা ৩৩৯
সাতটি অঙ্গে সেজদা করিতে হইবে ”
সেজদা করার নিয়ম ৩৪০
প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে সেজদা হইতে দাঁড়াইবার নিয়ম ৩৪১
দুই রাকাতের বৈঠকে তকবীর বলিবে ”
নামাযের মধ্যে বসিবার নিয়ম ”
নামাযে বসা অবস্থায় কি পড়িবে ? ৩৪২
সালামের পূর্বে দোয়া করিবে ৩৪৪
মোক্তাদী ইমামের সঙ্গে সালাম করিবে ৩৪৫
নামাযান্তে আল্লার জিকর করা ”
ইমামের ডান-বামে বা মোক্তাদীমুখী বসা ৩৪৭
দুর্গন্ধ বস্তু খাইয়া মসজিদে যাওয়া নিষেধ ৩৪৭
নারীদের মসজিদে যাওয়া ৩৪৮
জুমার দিন ও নামাযের আহকাম ৩৫৩
জুমার দিনে গোসল করা ৩৫৫
জুমার দিন সুগন্ধি ব্যবহার করা ৩৫৬
জুমার দিন তৈল ব্যবহার করা ”
জুমার দিন ভাল জামা-কাপড় পরিধান করা ”
জুমার দিন ফজরে কোন্ ছুরা পড়া উচিৎ ৩৫৭
গ্রাম ও শহর উভয়ের মধ্যেই জুমা জায়েয ”
জুমার নামাযে আদিষ্ট না হইলে সে গোসলে আদিষ্ট হইবে কি ? ৩৫৭
জুমার জমাতে উপস্থিতি অসাধ্য হইলে ৩৫৮
কতদূর ব্যবধান হইতে জুমায় উপস্থিত হওয়া ”
জুমার নামাযের ওয়াক্ত ৩৫৯
জুমার নামাযের জন্য পদব্রজে উপস্থিত হওয়া ”
জুমার দিন মসজিদে কাহাকেও উঠাইয়া তাহার স্থানে বসিবে না ”
জুমার আজান ”
ইমাম মিম্বরে বসিয়া আজানের উত্তর দিবেন ৩৬১
মিম্বরে দাঁড়াইয়া খোৎবা দিবে ”
খোৎবা আল্লার প্রশংসা দ্বারা আরম্ভ করিবে ”
দুই খোৎবার মধ্যে বসিতে হইবে ৩৬২
মনোযোগের সহিত খোৎবা শুনিবে ”
খোৎবার সময় আগত ব্যক্তির নামায পড়া ”

খোৎবার সময় হাত উঠানো ৩৬৩
খোৎবার মধ্যে বিশেষ দোয়া করা "
খোৎবা দানকালীন সকলে চুপ থাকিবে ৩৬৪
জুমার দিনের একটি মূল্যবান সময় আছে ৩৬৫
জুমার নামাযের পূর্বে ও পরে সুন্নত পড়া "
জুমার নামাযের অবসরে আমোদ-আনন্দ "
শত্রুর আক্রমণ সম্ভাবনাবস্থায় জমাতে নামায পড়ার নিয়ম ৩৬৬
যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় নামাযের নিয়ম ৩৬৮

ঈদের দিন ও উহার নামায

ঈদের দিন আমোদ-প্রমোদ করা ৩৬৯
ঈদগাহে যাইবার পূর্বে কিছু খাওয়া উচিৎ ৩৭১
ঈদগাহে মিম্বরের ব্যবস্থা আবশ্যক নহে ৩৭২
ঈদের খোৎবা নামাযের পরে এবং ঈদের নামাযে আজান একামত হইবে না ৩৭২
ঈদের দিন অস্ত্র বহন ৩৭৩
জিলহজ্জের প্রথম দশ দিন এবাদত করা "
ঈদগাহে এক পথে যাওয়া অন্য পথে আসা ৩৭৪
বেতের নামাযের বিবরণ ৩৭৬
বেতের নামায পড়িবার নিয়ম "
যানবাহনে থাকিয়া বেতের নামায পড়া ৩৭৭
দোয়া-কুনুৎ পড়ার স্থান ৩৭৮
এস্তেছকা নামাযের বিবরণ ৩৭৯
বৃষ্টি-বর্ষণ শরীরে বরণ করা ৩৮১
অধিক বেগে বায়ু বহিবার সময় দোয়া "
বৃষ্টি পাইয়া আল্লাহ ভিন্ন অন্য বস্তুর প্রতি সম্পৃক্ত করা আল্লার নাশোকরী ৩৮২
চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণকালীন নামায "
চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণকালে করণীয় আমলসমূহ ৩৮৮
কোরআন শরীফে সেজদার আয়াতসমূহ ৩৮৯
মুসাফিরের নামাযের বিবরণ ৩৯১
তাহাজ্জুদ নামাযের বিবরণ ৩৯৭
তাহাজ্জুদে লোকদিগকে আগ্রহান্বিত করা ৪০০
রসুল (দঃ) কত বেশী তাহাজ্জুদ পড়িতেন ৪০১
তাহাজ্জুদ নামাযে দীর্ঘ কেরাত পড়া ৪০২
নবী (দঃ) কত রাকাত তাহাজ্জুদ পড়িতেন "
তাহাজ্জুদের পর নিদ্রা যাওয়া ৪০৩
তাহাজ্জুদ না পড়িলে শয়তানে ক্রিয়া করে ৪০৩
যে ব্যক্তি সারারাত্র নিদ্রামগ্ন থাকে শয়তান তাহার কানে প্রস্রাব করে ৪০৩
শেষ রাত্রে নামায পড়া ও দোয়া করা ৪০৪
তাহাজ্জুদ নামাযের সময় শেষ রাত্রে ৪০৫
রসুল (দঃ) রমজানেও তাহাজ্জুদ পড়িতেন ৪০৬
প্রত্যেক জুমুর পরে নামায পড়ার ফজিলত ৪০৭
নফল এবাদতে প্রাবল্য অবলম্বন করা "
তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস ত্যাগ করা চাই না "
রাত্রিবেলা নিদ্রা ভঙ্গ হইলে নামায পড়া "
বেতেরের পর দুই রাকাত নামায বসিয়া পড়া এবং ফজরের সুন্নত না ছাড়া ৪০৮
ফজরের সুন্নতের পরে কথাবার্তা বলা "
এস্তেখারার নামায "
ফজরের সুন্নতের প্রতি বিশেষ তৎপরতা ৪০৯
ফজরের সুন্নতে কেরাত কিরূপ ? ৪১০
চাশতের নামায ৪১০
অন্যান্য সুন্নত নামায ৪১১
মক্কা ও মদীনার হরমের মসজিদে নামাযের ফজিলত ৪১২
নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষিদ্ধ ৪১৪
নামাযরত অবস্থায় মায়ের ডাক শুনিলে "
নামায অবস্থায় সেজদার স্থান পরিষ্কার করা ৪১৫
বিশেষ প্রয়োজনে নামাযে কোন কাজ করা "
নামাযের সময় যানবাহন—পশু ভাগিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হইলে ? ৪১৬
নামাযে সালামের উত্তর দেওয়া চাই না ৪১৭
নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখা ৪১৮
নামাযের মধ্যে নামায ভিন্ন অন্য ধ্যান করা "
ফরজ নামাযে প্রথম বৈঠক ছুটিলে ৪২০
ভুলবশতঃ পাঁচ রাকাত পড়িয়া ফেলে ৪২১
ভুলক্রমে ২ রাকাত পড়িয়াই যদি সালাম করে "

অষ্টম অধ্যায়—জানাযার বয়ান ৪২৩

জানাযার সঙ্গে যাওয়া ৪২৪
মৃতকে কাফন পরাইবার পূর্বে ও পরে দেখা ৪২৫
আত্মীয়-স্বজনকে মৃত্যু সংবাদ দেওয়া ৪২৭
জানাযায় যোগদানের সংবাদ দেওয়া ৪২৮
শিশু সন্তানের মৃত্যুতে ছওয়াবের আশা ৪২৯
মৃতকে গোসল গোসল দেওয়ার নিয়ম ৪৩০
সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া ৪৩১
এহরাম অবস্থায় মৃত ব্যক্তির কাফন ৪৩১

সাধারণ তৈরী জামা কাফনে দিবে না	৪৩২
প্রয়োজনে এক কাপড়েই কাফন দিবে	৪৩৫
জীবিতকালে স্বীয় কাফন তৈয়ার রাখা	৪৩৬
নারীদের জন্য শবযাত্রায় যোগ দেওয়া	,,
নারীদের জন্য শোক প্রকাশের নিয়ম	,,
কবর যেয়ারত করা	৪৩৭
কাহারও মৃত্যুতে ক্রন্দন করা	৪৩৮
শোক প্রকাশে কয়েকটি অপকর্ম	৪৪১
কাহারও মৃত্যুতে অনুতাপ প্রকাশ করা	,,
শোক প্রকাশে মাথার চুল ফেলা নিষেধ	৪৪২
কাহারও মৃত্যুতে শোকাভিভূত হওয়া	৪৪৩
শোকাবস্থায় শোকপ্রকাশ হইতে না দেওয়া	৪৪৩
শোকপ্রাপ্তির প্রথম ভাগে ছবর ও ধৈর্য্য	৪৪৪
শোকবাক্য মুখে উচ্চারণ করা	৪৪৫
রোগীর নিকট বসিয়া কাঁদা	৪৪৬
জানাযা আসিতে দেখিলে দাড়াইয়া যাইবে	৪৪৬
জানাযার সহযাত্রীরা বাহকদের স্কন্ধ হইতে জানাযা নামাইবার পূর্বে বসিবে না	৪৪৭
জানাযা লইয়া যথাসম্ভব দ্রুত চলিবে	৪৪৮
মৃত ব্যক্তি কি বলিয়া থাকে ?	,,
জানাযার নামায সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়	৪৪৯
দাফনকার্য্যে যোগদানের ছওয়াব	৪৫০
জানাযার নামাযে ইমামের দাড়াইবার স্থান	৪৫১
জানাযার নামাযে আলহামদু ছুরা পড়া	,,
পবিত্র ও বরকতের স্থানে সমাহিত হওয়া	৪৫২
শহীদের জন্য জানাযার নামায	৪৫৩
মৃতদেহকে কবর হইতে বাহির করা	৪৫৪
নাবালেগ বালক ইসলাম গ্রহণ করিলে শুদ্ধ	৪৫৫
মুমূর্ষু অবস্থায় কাফের কলেমা পড়িলে	৪৫৬
কবরের উপর ডালা ইত্যাদি গাড়িয়া দেওয়া	৪৫৭
আত্মহত্যাকারীর অবস্থা কি হইবে ?	,,
মৃতের প্রতি সর্বসাধারণের প্রশংসা	৪৫৮
কবরের আজাব	৪৬০
কবরের আজাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৪৭২
মৃত ব্যক্তিকে তাহার স্থান দেখান হয়	৪৭৩
মোসলমানের নাবালেগ সন্তান মৃত্যু হইলে	,,
কাফেরদের নাবালেগ সন্তানের মৃত্যু হইলে	,,
সোমবার দিন মৃত্যু হওয়া	৪৭৮
হযরত রসুলুল্লার (দঃ) কবরের বিবরণ	৪৭৯
মৃত ব্যক্তির প্রতি খারাব উক্তি করা চাই না	৪৮৩

——(•)——

ইমাম বোখারী (রঃ) পর্য্যন্ত অনুবাদকের সনদ

ইমাম মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী (রঃ)

১। শায়খ মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ফেরাবরী (রঃ)
২। " আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ সরখ্‌সী (রঃ)
৩। " আবদুর রহমান ইবনে মুজাফ্‌ফর দাউদী (রঃ)
৪। " আবদুল আউয়াল ইবনে ঈসা সিজযী (রঃ)
৫। " আস সেরাজুল হোসাইন ইবনুল মোবারক যবীদী (রঃ)
৬। " আবুল আব্বাস—আহমদ ইবনে আবু তালেব (রঃ)
৭। " ইব্রাহীম ইবনে আহমদ তরুখী (রঃ)
৮। " শেহাবুদ্দীন—আহমদ ইবনে হজর আসকালানী (রঃ)
৯। " যায়নুদ্দীন—যাকারিয়া আনছারী (রঃ)
১০। " শামছুদ্দীন রমলী (রঃ)
১১। " আহমদ ইবনে আবদুল কুদ্দুস শান্নাবী (রঃ)
১২। " আহমদ আল-কোশাশী (রঃ)
১৩। " ইব্রাহীম আল-কুর্দী (রঃ)
১৪। " আবু তাহের--মোহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম (রঃ)
১৫। " শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রঃ)
১৬। " আবদুল আজীজ দেহলভী (রঃ)
১৭। " মোহাম্মদ ইসহাক দেহলভী (রঃ)
১৮। " আবদুল গণী মোজাদ্দেদী (রঃ)

মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম (রঃ)—১৯। মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব (রঃ)
শায়খুল-হিন্দ মাহমুদুল হাসান (রঃ)—২০। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)
মাওঃ শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রঃ)—২১। মাওলানা জফর আহমদ ওসমানী (রঃ)

আজিজুল হক

অনুবাদকের দুইজন ওস্তাদ—মাওলানা শাব্বীর আহমদ (রঃ) ও মাওলানা জফর আহমদ (রঃ) উভয়ের মধ্যস্ততায় দুইটি সনদ দেখানো হইল—যাহা শাহ আবদুল গণীর উপর মিলিত হইয়াছে।

তৃতীয় একটি সনদ যাহার মাধ্যম সংখ্যা কম হওয়ায় উচ্চমানের পরিগণিত।

ইমাম মোহাম্মদ ইসমাঈল বোখারী—(১) মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ফেরাব্‌রী (২) ইয়াহয়া ইবনে আম্মার ইবনে মোকবেল ইবনে শাহান থাওলানী (৩) মোহাম্মদ ইবনে শাজবখ্‌ত (৪) বাবা ইউসুফ হেরাবী (৫) হাফেজ নূরুদ্দীন আবুল ফাতুহ আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ (৬) কুতুবুদ্দীন মোহাম্মদ ইবনে আহমদ নহরওয়ালী (৭) আহমদ ইবনে মোহাম্মদ আল-ইজ্‌ল (৮) মোহাম্মদ ইবনে ছালাহ্‌ (৯) ছালেহ ইবনে মোহাম্মদ আল ফালানী (১০) শায়খ আবেদ ছিন্দী (১১) শাহ আবদুল গণী মোজাদ্দেদী (১২) মাওলানা খলীল আহমদ সাহারণপুরী (১৩) মাওলানা জফর আহমদ ওসমানী—আজিজুল হক।

আরম্ভ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ● وَالصَّلٰوةُ وَ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগার। দরূদ এবং

السَّلَامُ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ●

সালাম সমস্ত নবী ও রসুলগণের প্রতি

خُصُوْصًا عَلٰى سَيِّدِهِمْ وَاَفْضَلِهِمْ نَبِيِّنَا

বিশেষতঃ নবী ও রসুলগণের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যিনি—যিনি আমাদের নবী এবং

خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ ● وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ●

সর্ব্বশেষ নবী—তাঁহার প্রতি দরূদ ও সালাম এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও সমস্ত ছাহাবীগণের প্রতি

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ●

এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত তাঁহাদের যত খাঁটি ও পূর্ণ অনুসারী হইবেন—তাঁহাদের প্রতি।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ●

আয় আল্লাহ। আমাদিগকে সেই অনুসারী দলভুক্ত বানাইবেন নিজ কৃপাবলে, হে দয়াময় সর্ব্বাধিক দয়ালু!

اٰمِيْن ! اٰمِيْن !! اٰمِيْن !!!

আমীন। আমীন।। আমীন।।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমানুর রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রতি অহী এবং উহার প্রাথমিক অবস্থা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ

"আমি আপনার প্রতি অহী প্রেরণ করিয়াছি—যেমন নূহ (আঃ) এবং তাঁহার পরবর্তী নবীগণের প্রতি অহী প্রেরণ করিয়াছিলাম।" অর্থাৎ মানব জাতির সংস্কার ও জীবন গঠনের যে নীতি ও আদর্শ আপনার নিকট প্রেরণ করা হইতেছে ইহার ছেলছেলাহ্ বা ক্রমানুবর্তন হযরত নূহ (আঃ) হইতে শুরু হইয়া তাঁহার পরবর্তী নবীগণের প্রতি যেমন আসিয়াছিল, তেমনি ভাবে আপনার প্রতিও আসিয়াছে। আল্লার তরফ হইতে এরূপ নীতি ও আদর্শ নাযেল হওয়া নূতন বিষয় নহে, যাহা দেখিয়া কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারে।

হযরত নূহ আলাইহেচ্ছালামের পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি অহী সাধারণতঃ জাগতিক প্রয়োজন ও জীবিকা নির্বাহের কার্য্য-পদ্ধতি শিক্ষা দানের বিষয়েই বেশী মাত্রায় অবতীর্ণ হইত, ধর্মীয় বিষয় মোটামুটি ও মৌলিক আকারে থাকিত। ইহজীবনেই পরকালের অধিক উন্নতি লাভের ব্যবস্থা—শরীয়তের বিস্তারিত বিবরণ ও আহকাম নূহ (আঃ) হইতেই নাযেল হওয়া আরম্ভ হয় এবং কালক্রমে উহা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর সম্পূর্ণতা লাভ করে, তাই এখানে হযরত নূহের প্রতি প্রেরিত অহীর তুলনা উল্লেখ করা হইয়াছে।

১। হাদীছ :— عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية. وانما لامرء ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه *

---

* এই হাদীছ খানা বোখারী শরীফের সাত জায়গায় উল্লেখ করা হইয়াছে, এখানে হাদীছ খানা অসম্পূর্ণ উল্লেখ হওয়ায় ৯২০ পৃষ্ঠা হইতে সম্পূর্ণ হাদীছ খানা এখানে উদ্ধৃত হইল।

অর্থ—ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, নিশ্চয় জানিও—আল্লার নিকট কাজের ফলাফল মানুষের নিয়্যত অনুসারে হয়। প্রত্যেক মানুষ তাহার কাজের ফলাফল আল্লার নিকট তদ্রূপই পাইবে যদ্রূপ সে নিয়্যত করিবে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লার রসুলকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হিজরত করিবে, সে আল্লার এবং রসুলের সন্তুষ্টি নিশ্চয়ই পাইবে। পক্ষান্তরে (এত বড় কষ্টের নেক কাজটিও ক্ষণস্থায়ী জগতের কোন হীনস্বার্থ প্রণোদিত হইয়া করিলে—যেমন, কিছু) টাকার লোভে বা কোন রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার এবং কামরিপু চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে করিলে তাহার ফল তদ্রূপই সে পাইবে যদ্রূপ সে নিয়্যত করিয়াছে।

নিয়্যত অর্থ ঃ—মনে মনে চিন্তা করতঃ উদ্দেশ্য ঠিক করিয়া কাজ করা।

হিজরত অর্থ ঃ—যে কোন স্থানে, যে কোন সংসর্গে বা যে কোন পরিবেশে থাকিয়া আল্লার দ্বীন পালন করা দুষ্কর হইয়া পড়িলে আল্লার আদেশ মতে সেই স্থান, সেই পরিবেশ পরিত্যাগ করা। প্রথম যুগে মোসলমানগণ মক্কায় তাহাদের ধর্ম-কর্ম অনুষ্ঠানে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় আল্লার তরফ হইতে তাহাদিগকে আদেশ করা হইয়াছিল মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদীনায় যাইতে। এই মহান কাজকে কোরআন-হাদীছের ভাষায় "হিজরত" বলা হয়।

সরল ব্যাখ্যা ঃ—মানুষ যখনই কোন কাজ করে, সে নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য মনে মনে ঠিক করিয়া ঐ কাজের প্রতি অগ্রসর হয়—ইহা মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব। এই উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষ তাহার কর্মের ফলাফল আল্লার নিকট পাইবে। যেমন, "হিজরত" অতি বড় পুণ্যের কাজ—অতি কঠোর ফরজ কাজ; এতে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ধন-দৌলত, ঘর-বাড়ী সবকিছু পরিত্যাগ করিতে হয়। কোরআন-হাদীছে হিজরতের অনেক ছওয়াব, অনেক ফজিলত বর্ণনা করা হইয়াছে। যখন কোন ব্যক্তি সব কিছু পরিত্যাগ করতঃ এই কঠিন আমলের জন্য প্রস্তুত হইবে, নিশ্চয় সে একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়া অগ্রসর হইবে। যদি তাহার উদ্দেশ্য হয় এই মহান ত্যাগের দ্বারা আল্লাহকে এবং আল্লার রসুলকে সন্তুষ্ট করা এবং মদীনাতে থাকিয়া ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা, তবে সে তাহার এই কর্মের ফল তাহার উদ্দেশ্য ও নিয়্যত অনুসারেই পাইবে। অর্থাৎ ছওয়াব ও ফজিলতের অধিকারী হইবে, আল্লার নিকট বড় মর্তবা পাইবে, তাহার এই দেশত্যাগ সার্থক হইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়া হিজরত করিবে, যেমন সুখ্যাতি লাভ করা, টাকা উপার্জন করা, কোন রমণীর প্রেম করা বা এই জাতীয় অন্য কোন হীন স্বার্থ হাসিল করা, সে কোনরূপ ছওয়াব বা ফজিলত পাইবে না, বরং আল্লার নিকট তাহার হিজরত অনর্থক হইবে। যেরূপ নানারকম উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করা হয়, তাহার জন্য মদীনায় আসাও তদ্রূপই গণ্য করা হইবে। আল্লার নিকট হিজরতরূপে গৃহীত হইবে না। এত কষ্ট, এত ত্যাগ স্বীকার করা সত্ত্বেও নিয়্যত খালেছ ও শুদ্ধ না হওয়ার কারণে আল্লার নিকট এত কঠিন আমলেরও কোন মূল্য হয় না।

রসূলুল্লাহ (দঃ) এখানে হিজরতকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, হিজরত এত বড় মহৎ কাজ ও মহান ত্যাগ হওয়া সত্ত্বেও মানুষের নিয়্যতের তারতম্যের কারণে তাহার ফলাফলেও কতদূর পার্থক্য হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেকটি কাজেই নিয়্যতের তারতম্যের কারণে পার্থক্য থাকিবে। যেমন—অন্য এক হাদীছে হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, (একদল লোক হইতে) সর্বপ্রথম বিচারের জন্য কেয়ামতের দিন এমন একজন লোককে হাজির করা হইবে, যে স্বীয় জীবন কোরবান করিয়া শহীদ হইয়াছিল। সে আল্লাহ তায়ালার যে সমস্ত নেয়ামত সমূহ উপভোগ করিয়াছে (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, হস্ত, পদ, আগুন, পানি, মাটি, বাতাস, আহার, বিবেক বুদ্ধি ও শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি) সেই সমস্ত তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি এই সমস্ত নেয়ামতের শোকর কি করিয়াছ? শোকরিয়া স্বরূপ কি কি কাজ করিয়াছ? সে উত্তর করিবে, হে প্রভু! আমি তোমার দ্বীনের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত কোরবান করিয়াছি, জেহাদ করিয়া শহীদ হইয়াছি, তোমার ইসলামের জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করি নাই। তখন আল্লাহ বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিতেছ—তুমি আমার জন্য বা আমার দ্বীন ইসলামের জন্য জেহাদ কর নাই, তুমি জেহাদ করিয়াছ নাম ও যশের জন্য, বড় বীর পুরুষ বলিয়া অভিহিত হওয়ার জন্য। তুমি সে ফল পাইয়াছ, অর্থাৎ লোকে তোমাকে "বড় বীর পুরুষ" বলিয়াছে। আমার জন্য তুমি কোন কাজ কর নাই, সুতরাং আমার এখানে তোমার কোন পুরস্কার নাই। অতঃপর ফেরেশতাগণ আদেশ পাইয়া তাহাকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া দোযখে নিক্ষেপ করিবে। তারপর একজন আলেমকে হাজির করা হইবে। তিনি কোরআন-হাদীছ শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং প্রকাশ্যে বাহ্যিক ভাবে তদ্রূপ আমলও করিতেন, তাহাকেও পূর্বোক্তরূপে জিজ্ঞাসা করা হইবে। তিনি উত্তর দিবেন, দয়াময় প্রভু! আমি জীবনভর আপনার কোরআন এবং আপনার রসূলের হাদীছ শিক্ষা করিয়াছি এবং শিক্ষা দিয়াছি—এ সবই একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য করিয়াছি। আল্লাহ বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিতেছ, তোমার উদ্দেশ্য ছিল, লোকে তোমাকে আলেম সাহেব, হাফেজ সাহেব, মাওলানা সাহেব বলিয়া সম্মান করুক, (হাদিয়া নজরানা পেশ করুক ইত্যাদি) সে সব তুমি পাইয়াছ। লোকে তোমাকে যথেষ্ট সম্মান ও তাজীম করিয়াছে। তুমি আমার জন্য বা আমার ইসলামের জন্য কিছুই কর নাই; কাজেই আমার নিকট তোমার কোন পুরস্কারও নাই। অতঃপর ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার আদেশে তাহাকেও হেঁচড়াইয়া টানিয়া আনিয়া দোজখে নিক্ষেপ করিবে। তারপর একজন ছখী দানশীল ধনীকে উপস্থিত করা হইবে। তাহাকেও ঐরূপ প্রশ্ন করা হইবে এবং সে উত্তর করিবে, হে দয়াময় প্রভু! যে যে স্থানে দান করিলে তুমি সন্তুষ্ট হও, সে সমস্ত জায়গায় আমি দান-খয়রাত করিয়াছি—একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহ বলিবেন—তুমি মিথ্যুক, তোমার নিয়্যতে ছিল যে, তোমার নাম হউক; লোকে তোমাকে দাতা বলুক, লোকে

তাহা বলিয়াছে। সত্যিকারভাবে তুমি আমার উদ্দেশ্যে কিছুই কর নাই; কাজেই আমার কাছে তোমার কোন পুরস্কার নাই। অতঃপর তাহাকেও ঐরূপে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। (মোসলেম শরীফ)

পাঠকবর্গ! হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রত্যেকটি কার্য্য এবং প্রত্যেকটি বাক্যের ভিতর জগদ্বাসীর জন্য অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় আদর্শ মূলনীতি নিহিত থাকে। আলোচ্য হাদীছটির ভিতরেও প্রত্যেকটি মানুষের জন্য তার জীবন গঠন ব্যাপারে অতি মূল্যবান একটি মূলনীতি রহিয়াছে। এখান হইতে উহা চয়ন করিয়া লইয়া জীবনের কর্মসূচীর মূলে ইহাকে স্থান দান করাই স্বীয় জীবনকে স্বার্থক করার একমাত্র উপায় এবং ইহা ব্যতিরেকে তাহার জীবন ব্যর্থ হইতে বাধ্য—এই সতর্কবাণীও প্রত্যেকের স্মরণ রাখা উচিত।

সেই মূলনীতিটি হইল এহলাহে-নিয়্যাত অর্থাৎ নিয়্যত দুরস্ত করা। এতদ্বারা দুইটি বিষয় বুঝায়; প্রথমতঃ—কার্য্যের পূর্বে উদ্দেশ্য স্থির করা, গাফলতীর সহিত লক্ষ্যহীন অবস্থায় কোন কাজ না করা। দ্বিতীয়তঃ—উদ্দেশ্য স্থির হওয়ার পর উহাকে আল্লাহ ও রসূলের নির্দ্ধারিত কষ্টি পাথরে ঘসিয়া দেখা যে, ইহা দ্বারা আল্লাহ ও রসূল সন্তুষ্ট হইবেন, কি অসন্তুষ্ট। মোটকথা, কর্ম জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ এরূপ সতর্কতামূলক হওয়া চাই যেমন বাবলা কাঁটার গভীর জঙ্গলে নগ্ন পা রাখিতে হইয়া থাকে। সদা শঙ্কিত থাকিবে, যেন আমার প্রভু আমাকে এরূপ কোনও উদ্দেশ্য চয়নে না দেখেন যাহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হন।

এই মূলনীতির প্রভাব অতি ব্যাপক। মানব জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যত ক্ষেত্রের যত কাজ সম্মুখে আসিবে, প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজ তাহাকে অতি সতর্কতা সহকারে এই মূলনীতি সামনে রাখিয়া উহাকে কাজে পরিণত করিতে হইবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে, আন্দোলনের ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এবং সাংসারিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক, শিল্প ব্যবসায় ও চাকুরী জীবনের দায়িত্ব পালনে এই মূলনীতির দ্বারা মানব সমাজ বহু উন্নতি সাধন করিবে, এই আশায়ই স্বয়ং রসূলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার পরে তাঁহার সুযোগ্য খলীফা ওমর (রাঃ) মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া সর্বসাধারণ্যে এই হাদীছখানা এবং এই মূলনীতি প্রচার করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়—বর্তমান কালের নেতৃত্ব দখলকারী লীডারগণ এবং আন্দোলনকারী কর্মীগণ সকলেই এই মূলনীতিকে বাদ দিয়া এই মহা-মূল্যবান আদর্শ হইতে বহু দূরে সরিয়া নেতৃত্ব ও আন্দোলন চালাইলেন। তারই ফলে যে উম্মতে মোহাম্মদীর প্রতিটি কর্মীর প্রত্যেকটি কাজ নিখুঁত, মহান, অতি উন্নত এবং কামিয়াব হওয়া উচিত ছিল, সেই উম্মত নামধারীদের প্রতিটি কাজই আজ বিফল ও দুর্নীতিপূর্ণ হইতেছে। দুর্নীতি দূর করার বহু প্ল্যান-প্রোগ্রাম করা হইতেছে বটে, কিন্তু সেই প্ল্যান প্রোগ্রামই আবার দুর্নীতিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ইহা হইতে জাতি ও দেশকে বাঁচাইতে হইলে সমাজের প্রত্যেকটি লোকের ভিতর এই মূলনীতির আদর্শ অনুযায়ী এখলাছ, লিল্লাহিয়্যাত—আল্লার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা, আখেরাতের হিসাবের ভয় করা,

আল্লার দীন-ইসলামের ও মোসলেম জাতির উন্নতি সাধনের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা এবং আল্লার বান্দাদের সেবার জন্য কাজ করা ইত্যাদি আদর্শ, মনোবল ও প্রেরণা সৃষ্টি করিতে হইবে।

এই হাদীছে বর্ণিত মূলনীতির আদর্শ যেমন বড় বড় কর্মক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনই ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়সমূহেও প্রযোজ্য এবং প্রতি ক্ষেত্রেই এই আদর্শের অনুসরণ করিলে প্রকৃত উন্নতির পথ খুজিয়া পাওয়া যাইবে।

ইমাম গাযযালী (রঃ) দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন—যেমন আতর ইত্যাদি সুগন্ধি যদি কেহ শুধু সুগন্ধ উপভোগের বা সুন্দর পরিপাটি দেখাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তবে উহা একটি "মোবাহ" কাজ হইবে; উহাতে ছওয়াব বা গোনাহের প্রশ্নই আসে না। আর যদি কেহ নিজের অহঙ্কার বা লোক সম্মুখে নিজের বড়ত্ব ও অন্যান্য লোকদের হেয়ত্ব প্রকাশার্থে অথবা উহা হইতেও জঘন্য—বেগানা নারী বা পুরুষদের চিত্তাকর্ষণার্থে ব্যবহার করে, তবে এই সুগন্ধি এবং সুপারপাট্য তার পক্ষে অতি বড় গোনাহে পরিণত হইবে। আর যদি কেহ এই সব জিনিস ব্যবহার করে রসুলুল্লাহ (দঃ) সুগন্ধি পছন্দ করিতেন এই উদ্দেশ্যে বা লোক সমাজে গেলে খারাব গন্ধে তাহাদের কষ্ট হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে এবং সুগন্ধি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দ্বারা নিজের মন-মস্তিষ্ক প্রফুল্ল ও স্নিগ্ধ থাকিবে, নিজের কর্তব্য কাজ, দায়িত্ব পালন, এবাদত-বন্দেগী ভাল ভাবে করা যাইবে—এই উদ্দেশ্যে তবে এই সাধারণ কাজের জন্যও সে বহু ছওয়াব আহরণ করিতে পারে। এইরূপ আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, ভ্রমন, মেহনত ইত্যাদি জীবন ধারণের কাজ-কর্মে আল্লার নির্দ্ধারিত দায়িত্ব পালন ও আল্লার বন্দেগী সমাধা করিবার শক্তি ও সামর্থ্য সঞ্চয়ের নিয়্যত করিলে এ সমস্ত কার্য্য সমূহও এবাদতে পরিণত হয়। বিবাহ কার্য্য এবং স্ত্রী ব্যবহারে যদিও স্থূল দৃষ্টিতে কামরিপু চরিতার্থ করাই হয় তবুও নিজের চরিত্রকে পবিত্র রাখা, কুপথ ও কু-কর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকা, নেক সন্তান হাসিল করা, আখেরাতের পথে এবং কর্তব্য পালনে সাহায্য-কারী সংগ্রহ করা, সুন্নতের পায়রবী করা ইত্যাদি সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যের নিয়্যত করিলে এই সব কাজও বড় বন্দেগীরূপে গণ্য হয় এবং অনেক ছওয়াব হাসিল হয়।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! চিন্তা করুন, সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যের নিয়্যত করাতে এবং একটু চিন্তা করিয়া দেলের নিয়্যতটা খাঁটী করিয়া লওয়াতে খাদ্যের স্বাদ বদলাইয়া যায় না, পরিশ্রমের আয়-রোজগার কম হইয়া যায় না, স্ত্রী ব্যবহারে আনন্দও কমিয়া যায় না—সবই পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু শুধু দেলটা ঠিক করিয়া নিয়্যতটা একটু খোদার দিক করিয়া লওয়াতে কত নেকী কত ছওয়াব হাসিল হইয়া থাকে; কাজের মূল্য ও উৎকর্ষতা কত বাড়িয়া যায়! সত্য বলিতে গেলে পিতল সোনায় পরিণত হয়।

হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শিক্ষা এমনই অমূল্য রত্ন যে, এই শিক্ষার ভিতর দিয়া দুনিয়ার কোন কাজে, দুনিয়ার কোন উন্নতি প্রগতির ব্যাপারে আদৌ কোন ক্ষতি হয় না—অথচ ক্ষণস্থায়ী জীবনের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিরস্থায়ী

জীবনের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির পথ খুলিয়া যায়। এমনকি সাধারণতঃ যে সমস্ত কাজ-কর্মকে ভোগ-বিলাস মনে করা হয়, উহার ভিতর দিয়াও খোদাকে পাইবার এবং আখেরাতের দৌলত উপার্জনের পথ পরিষ্কার হইয়া যায়। এখানেই কোরআন-হাদীছের শিক্ষার মাহাত্ম্য যে, ইহাতে দুনিয়া নষ্ট না করিয়াই আখেরাতের পথ দেখান হইয়াছে। আর বর্তমান যুগের জড়বাদী মতবাদগুলিতে চিরস্থায়ী জীবনের আখেরাতকে একেবারে ডুবাইয়া দিয়া শুধু ক্ষণস্থায়ী জীবন এই দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধির পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইসলামী শিক্ষা হইতে অজ্ঞ থাকার দরুন প্রতি মুহূর্তে শত শত নেকী হাসিলের সুযোগ হইতে আমরা মাহরূম ও বঞ্চিত থাকিতেছি।

এখানে একটী বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মানুষের যাবতীয় কার্য্যাবলী তিন ভাগে বিভক্ত। যথা:—(১) মা'ছিয়াত অর্থাৎ মন্দ কাজসমূহ, (২) হাছানাত অর্থাৎ ভাল ও সৎ কাজসমূহ, (৩) মোবাহাত অর্থাৎ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের কাজসমূহ— যাহাতে ধরা বাঁধা ছওয়াব বা গোনাহ নাই।

যে সমস্ত কাজ কোরআন-হাদীছে স্পষ্ট ভাষায় গোনাহ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাকে "মা'ছিয়াত" বলা হয়। যথা:—ঘুষ লওয়া, চুরি করা, জেনা করা, জুয়া খেলা, সুদ খাওয়া, শরাব পান করা, আমানতে খেয়ানত করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, নামায না পড়া, যাকাত না দেওয়া, রোযা না রাখা, আল্লার রসূলের বা কোরআন-হাদীছের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা ইত্যাদি সমস্তই পাপ এবং মন্দ কাজ। নিয়্যতের দ্বারা এই শ্রেণীর কাজ সমূহকে কিছুতেই ভাল বা ছওয়াবের কাজে পরিণত করা সম্ভব নয়। অধিকন্তু যদি কেহ পাপ কাজ ছওয়াবের নিয়্যতে করে তবে তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে. সে আল্লার নিষিদ্ধ কাজ করে অথচ মুখে বলে যে আমি এই কাজ করিতেছি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। যেমন কেহ নিমের ফল খাইতেছে আর বলিতেছে আমি মিষ্টির স্বাদ পাইবার জন্য নিমের ফল খাইতেছি। এইরূপ ব্যক্তিকে শুধু বোকা নয় পাগল বলিতে হইবে। এই জন্যই শরীয়তের ভাষায় এরূপ ব্যক্তিকে শুধু ফাছেকই নয় বরং কাফের বলা হইবে। কারণ সে প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লার সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছে।

যে সমস্ত কাজকে শরীয়তে ভাল বা জরুরী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাকে "হাছানাত" বলা হয়। যেমন—নামায পড়া, রোযা রাখা, যাকাত দেওয়া, হজ্জ করা, সত্য কথা বলা, ন্যায় বিচার করা, মেহমানের খেদমত করা, পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের উপকার করা, গরীবের সাহায্য করা, মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা, দায়িত্ব পালন করা, অঙ্গীকার রক্ষা করা, সতীত্ব রক্ষা করা, মুরব্বীকে মান্য করা ও ছোটদিগকে স্নেহ করা ইত্যাদি ইত্যাদি। হাছানাত বা সৎকার্য্যাবলী অবশ্য করণীয়— না করিলে শাস্তি হইবে এইরূপ অপরিহার্য্য পর্য্যায়ের হইলে তাহাকে "ফরয" বা "ওয়াজেব" বলা হয়। করিবার জন্য তাকীদ থাকিলে তাহকে "সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ" বলা হয় এবং ভাল

কাজ বলিয়া প্রশংসা করা হইলে বা করিবার জন্য আদেশ না করিয়া শুধু উৎসাহ প্রদান করা হইয়া থাকিলে তাহাকে মোস্তাহাব বা নফল বলা হয়। হাছানাত পর্য্যায়ের কাজগুলি সুষ্ঠু নিয়্যত ব্যতিরেকে অস্তিত্বহীন এবং নিষ্ফল হইয়া যায় অর্থাৎ আল্লার নিকট ছওয়াব পাওয়ার যোগ্য থাকে না। বরং অপনিয়্যতের দরুণ হাছানাত অপকর্মে ও মা'ছিয়াতে পরিণত হইয়া যায়। যেমন--সবচেয়ে বড় হাছানাহ (নেক কাজ) হইতেছে ইসলাম গ্রহণ করা অর্থাৎ আল্লার এবং আল্লার রসুলের আনুগত্য, আখেরাতের হিসাব-নিকাশ ও বেহেশত ও দোযখের অস্তিত্ব এবং আল্লার বাণী কোরআনের এবং রসুলের বাণী কোরআনের এবং রসুলের বাণী হাদীছের সত্যতা স্বীকার করা। ইহাও যদি কেহ শুধু মুখে মুখে স্বীকার করে কিন্তু দেলে দেলে আল্লাহ ব্যতীত হীনস্বার্থ ইত্যাদি অন্য কোনরূপ উদ্দেশ্য রাখে তবে তাহাকে বলে মোনাফেক। মোনাফেকের জন্য দোযখের সর্বনিম্ন স্তর এবং সবচেয়ে বেশী শাস্তি নির্দ্ধারিত আছে। নামায ইসলামের প্রধান রোকন; ইহা যদি কেহ বিনা নিয়্যত তথা অন্ততঃ মনের মধ্যে নামায পড়ার এরাদা ও ইচ্ছা ব্যতিরেকে পড়ে তবে আদৌ কোন মূল্য নাই, নামায হইবে না। আর যদি কেহ অপনিয়্যতে অর্থাৎ রিয়াকারী—লোক-দেখানো বা সুখ্যাতি অর্জন ইত্যাদি হীনস্বার্থের নিয়্যতে পড়ে তবে তাহাতে ছওয়াবের পরিবর্তে ভীষণ আজাব—ওয়ায়েল নামক দোযখের শাস্তি হইবে। পবিত্র কোরআন শরীফে ৩০ পারা ছুরা মাউনে আছে—

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ - الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ......

"ওয়ায়েল-দোযখ ঐ শ্রেণীর নামাযীদের জন্য যাহারা নামাযের ব্যাপারে গাফেল— সময় সময় পড়িলেও উদাসীনরূপে পড়ে; যাহারা লোক-দেখানো উদ্দেশ্যে নামায পড়ে।"

প্রত্যেক নেক কাজেই নিয়্যত খালেছ করার একান্ত প্রয়োজন আছে। নিয়্যত খালেছ না হইলে আজাবের কারণ হইবে। যেমন মোসলেম শরীফের একটি হাদীছ উদ্ধৃত হইয়াছে।

যে সব কাজে মানুষকে আল্লাহ তায়ালা স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের অধিকার দিয়াছেন তাহাকে বলে মোবাহাত। যেমন—খাওয়া, পরা, শোওয়া, কথা বলা, দেখা, শোনা, হাটা, চলা, জীবিকা উপার্জন করা, কৃষি শিল্প ও ব্যবসায়ে উন্নতি করা, মস্তিষ্ক চালনা করিয়া বিজ্ঞানে উন্নতি করা, বিভিন্ন দেশ পর্যটন করা, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করা ইত্যাদি। নিয়্যতের তারতম্য বিশেষভাবে মোবাহ পর্য্যায়ের কার্য্যসমূহেই প্রয়োগ হইয়া থাকে। মোবাহ পর্য্যায়ের যে কোন একটা কাজ আল্লার সন্তুষ্টি ও আল্লার দাসত্বের ধ্যান করতঃ নিয়্যত ঠিক করিয়া করিলে তখন আর ঐ কাজটি শুধু মোবাহ থাকে না, উহা একটি উচ্চ পর্য্যায়ের ছওয়াবের ও এবাদতের কাজে পরিণত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে ঐ কাজটিকেই কোন অপনিয়্যতে করিলে উহা মা'ছিয়াত বা গোনাহের কাজে পরিণত হইয়া যায়। যেমন ইমাম গায্যালীর (রঃ) বর্ণনায় দেখান হইয়াছে যে, সমস্ত মোবাহ কাজসমূহকে নেক কাজে

বা গোনাহতে পরিণত করা নিয়্যতের উপরই নির্ভর করে। এই হাদীছের ইহাই তাৎপর্য্য যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদের জন্য একদিকে যেমন মা'ছিয়াত ও হাছানাতের ময়দানের চেয়ে মোবাহাতের ময়দানকে অধিক প্রশস্ত করিয়াছেন, তদ্রূপ এইসব মোবাহাত অর্থাৎ দুনিয়াদারীর সামান্য সামান্য পিতলের জিনিষকে কিরূপে সোনায় পরিণত করিয়া ক্ষণস্থায়ী ইহজীবনের শান্তির ও উন্নতির সহিত চিরস্থায়ী আখেরাতের জীবনের অফুরন্ত শান্তি ও আনন্দ লাভের উপায় করিতে হইবে, সেই ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন।

এই হাদীছ খানাতে অহী সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করা হয় নাই। তা সত্ত্বেও ইমাম বোখারী (রঃ) ইহাকে অহীর বর্ণনার শিরোনামাভুক্ত কেমন করিয়া করিলেন? এ বিষয়ে সমালোচনা ও গবেষণা হইয়াছে। সোজা কথা এই যে, যেহেতু দ্বীন ও সত্য ধর্মের ভিত্তিপাত হয় অহীর দ্বারা এবং মানুষের জীবন গঠন আরম্ভ হয় নিয়্যতের দ্বারা। দেল ঠিক করিয়া মকছুদ ও লক্ষ্য স্থির করিয়া—যে আমার একমাত্র মকছুদ ও জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য আল্লাহকে পাওয়া, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা—এই কথা মনে মনে স্থির করিয়া জীবন যাত্রা আরম্ভ করার দ্বারাই হয় মানুষের জীবন গঠনের ভিত্তিপাত। সেই জন্য নিজে আমল করিয়া দেখাইবার জন্য এবং পাঠকবর্গকেও তদনুরূপ আমল করিবার আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য কেতাব আরম্ভ করার ও অহীর কথা বর্ণনা করার পূর্বে নিয়্যত সম্বন্ধে হাদীছ খানা বর্ণনা করা হইয়াছে।

২। হাদীছ :— عن عائشة رضى الله تعالى عنها سئل هشام بن حارث

قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحى فقال احيانا يأتينى مثل

صلصلة الجرس وهو اشده على فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال واحيانا

يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فاعى ما يقول قالت عائشة ولقد رايته

ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم

عنه وان جبينه ليتفصد عرقا۔

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হারেছ ইবনে হেশাম (রাঃ) রসূলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—ইয়া রসূলাল্লাহ (দঃ)! আপনার নিকট অহী কিভাবে আসে? তিনি বলিলেন, কোন সময় এমন হয় যে, একটি (চিত্তাকর্ষক) টুণ্ টুণ্ শব্দ আমি শুনিতে পাই। (সেই আওয়াজ আমাকে এই জগতের অনুভূতি হইতে উদাসীন করিয়া অন্তর্জগতের দিকে আকৃষ্ট করিয়া নেয়। তখন আল্লার বাণী আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত

হইতে থাকে এবং ঐ আওয়াজ বন্ধ হইতে না হইতেই যাহা বলা হয় সব কিছুই আমি অন্তরস্থ করিয়া লই।) এই প্রকারের অহী আমার জন্য বড়ই শ্রান্তিদায়ক হয়। আর কোন কোন সময় স্বয়ং ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধারণ করিয়া আমার নিকট আসেন এবং আল্লার বাণী আমাকে বলিয়া দেন, আমি তাহা মুখস্থ ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া লই। (এই দ্বিতীয় প্রকারের অহীতে বিশেষ কোন শ্রান্তি বা কষ্ট হয় না) প্রথম প্রকারের অহী সম্বন্ধে আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি অতি প্রচণ্ড শীতের সময়ও নবী (দঃ)কে অহী নাযেল হওয়ার সময় ঘর্মাক্ত হইতে দেখিয়াছি।

ব্যাখ্যা ঃ—صلصلة الجرس অর্থ ঘণ্টার অবিরাম টুণ্ টুণি আওয়াজ। এই আওয়াজ অহী আসার সঙ্কেত স্বরূপ ছিল। ইহা কখনও কখনও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য লোকেরাও শুনিতে পাইতেন। যেমন ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন—অহী নাযেল হওয়ার সময়ে আমরা মৌমাছির ঝাক্ উড়িয়া বেড়াইবার সময় যেমন এক প্রকার বিরতি বিহীন গুঞ্জন শুনা যায়, ঐরূপ আওয়াজ শুনিতে পাইতাম। অহী নাযেল হওয়ার কারণে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দৈহিক কোন কষ্ট শ্রম হইত কি-না; এবং কেন? প্রথম প্রকার অহীর দরুণ যে, রসুলুল্লার দেহে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইত তাহা বিবি আয়েশার চাক্ষুষ সাক্ষ্যে যে, প্রচণ্ড শীতের সময় হযরতের চেহারা মোবারক এবং দেহ হইতে ঘাম ঝরিতে থাকিত স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

মানুষের সাকার দেহ নশ্বর জড়পিণ্ড তাহার নিরাকার অনন্ত অসীম আত্মার জন্য এক প্রকার খাঁচার মত। এই খাঁচার সহিত আত্মার একটা যোগাযোগ নিশ্চয়ই থাকে। এই যোগাযোগকে ছিন্ন করিয়া যখন সকল আত্মার আত্মা যিনি, তাঁহার দিকে তাহার পূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন করিতে হয়, তখন তাহার নিশ্চয়ই কষ্ট ও শ্রান্তি হয় কিন্তু এই শ্রান্তি যে, কি মধুর তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। এই যোগাযোগ যখন পূর্ণরূপে স্থাপিত হয়, তখন দেহের উপর যে, কি চাপ পড়ে তাহা একজন ছাহাবীর বর্ণনায় কিছুটা অনুমান করা যায়। তিনি বলেন—একদিন আমি হযরতের পাশাপাশি বসিয়াছিলাম; হযরতের উরু সামান্য পরিমাণে আমার উরুর উপর ছিল। এই অবস্থায় মাত্র ২।৩ শব্দের একটি অহী নাযেল হওয়াতে আমি মনে করিতেছিলাম যে, হয়ত আমার উরুর সমস্ত হাড্ডি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। চাক্ষুষ জগতে ইহার কিছু দৃষ্টান্ত হইতে পারে যে, একটি সাধারণ লোহার বা তাহার তারের সহিত বিদ্যুৎ শক্তির যোগাযোগ করিয়া দিলে ঐ তারটির বাহ্যিক পরিবর্তন না হইয়াও তাহার ভিতর এক ভীষণ চাপের ঢেউ খেলে। তাহাতে ঐ তারটির ভিতরে যে অপরিসীম শক্তি ও তাপ মাত্রার সঞ্চার হয় তাহা-বাহ্যতঃ দৃশ্য না হইলেও তারটিকে স্পর্শ করিলেই তাহা অনুভূত হয়। হাদীছে বর্ণিত আছে যে, অহী নাযেল হওয়ার সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখমণ্ডলে শ্রান্তির ভাব পরিলক্ষিত হইত—তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া যাইত।